শুকসারী

সন্তোষকুমার ঘোষ

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১ কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট

নির্মলা কৃষ্ণা

ব্লক—বেঙ্গল ফোটোটাইপ কোং লিমিটেড্

৪৬।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

অনুশীলন প্রেস

৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সুচী

এই লেখকের অন্যান্য বই

কিনু গোয়ালার গলি (২য় সংস্করণ)

নানা রঙের দিন

শ্রেষ্ঠ গল্প

চীনেমাটি

বিষকণ্ঠ (যন্ত্রস্থ)

মোমের পুতুল (যন্ত্রস্থ)

মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে নির্মল একেবারে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। লতিকাকে ডেকে বলল, 'এস লতু।'

লতিকার হাতের মধ্যে তখনও দুটো রূপোর টাকা বাজছে, আঁচলে চাবি। মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে ভ্রু কুঞ্চিত করল। বলল, 'পথ ছাড়ুন। আপনাকে আমি কতদিন বলেছি না, আমাকে নাম ধরে ডাকবেন না?

নির্মল থতমত খেয়েছে সেটা ওর চালাক-চালাক হাসি সত্ত্বেও অনুমান করা গেল।—'কী বলে ডাকব?'

'ডাকতেই হবে না আপনাকে।' লতিকা আবার কড়াধমক-গলায় বলল, 'আচ্ছা, আপনি বাইরে এসে চুল আঁচড়ান কেন?'

কপাল থেকে চিরুণীটা টানতে টানতে ঘাড় অবধি নামিয়ে নির্মল বলল, 'কী করি, ঘরে আলো নেই যে। এমন খাসা প্ল্যানে তোমার বাবা বাড়ি তৈরি করেছেন যে তেজ মরুৎ ব্যোম, এই তিনটি ভূত কাছেও ঘেঁষতে পায় না।'

লতিকা বলল 'পথ ছাড়ুন।'

নির্মল তখনো হাসছে। বলল, 'ছাড়ি, ছাড়ি। তাড়া কিসের?' তোয়ালে দিয়ে মুখখানা পরিষ্কার মুছে বলল, 'সিঁথির পাট তুলে দিলাম। এবার থেকে ব্যাকব্রাশ। কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি।'

এই লোকটার সঙ্গে কথা বলাও বিড়ম্বনা। লতিকা আবার বলল, 'পথ ছাড়ুন।'

কর্ণপাত না করে নির্মল বলল, 'ভাবছি এবার কার্লিং করিয়ে নেব। তা হলে ফাশ্ক্লাশ হবে। এসব আজকাল মেসিনে হয়। সেদিন একটা দোকান দেখেও এসেছি।'

লতিকা হেসে ফেললে। 'পুরুষ মানুষের এত চুলের শখ আপনারই দেখলুম নির্মলবাবু।'

নির্মল বলল 'চুল থাকলেই শখ থাকে লতু। দাঁত থাকলেই দাঁত ব্যথা।'

তীর গিয়ে বিঁধল ঠিক মর্মে। লতিকা ছাই-শাদা হয়ে গেল। ওর সিঁথির ডান পাশ দিয়ে চুল পাতলা হতে হতে এখন টাক পড়ার উপক্রম। কান ঢেকে পাতা কাটলেও এখন টাক ঢাকে না। এ-লজ্জা কি সোজা, বিশেষ মেয়েমানুষের।

চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে লতিকা বলল, 'আপনি ভদ্রলোকের মত কথাও বলতে জানেন না, নির্মলবাবু।'

নির্মল চেঁচিয়ে বলল, 'আরে শোন শোন। চটো কেন। আজকের আনন্দবাজারে একটা আয়ুর্বেদীয় কেশতৈলের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। দেখে যাও।'

লতিকা উৎসুক হয়ে একটু দাঁড়াল। কী ভাবল। কিন্তু ফিরল না।

গেল সোজা, সদর দরজার কাছাকাছি, ব্যোমকেশের ঘরে, অনেক কাল আগে যেটা বৈঠকখানা ছিল।

লুঙ্গিমত করে ধুতি-পরা, তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে ব্যোমকেশ নেবা নেবা বিড়িটাকে ফের বহ্নিমান করার ফিকিরে ছিল। টাকা দুটি বাজাতে বাজাতে লতিকা সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল। বলল, 'এক পো মাছ আনবে, আণ্ডসের আলু। ঝিঙে, পটল আর আমড়া।'

ব্যোমকেশ বলল, 'আরে বাস্। লম্বা লিষ্টি যে। মনে কি থাকবে এত।'

লতিকা চোখ নামিয়ে বলল, 'আর, হিসেব দেবে ঠিক ঠিক।'

ব্যোমকেশ বলল, 'একেবারে পাইপয়সা মিলিয়ে দেব, দেখো।'

'ঈস ! রোজই চার-ছ' আনার গরমিল হয়, বাবার কাছে হিসেব দিতে আমি হিমসিম খাই।'

যাবার সময় ধরেছিল দেওর, ফেরবার পথে পাকড়াও করল তার বৌদি। এক চোখ বুঁজে আরেক চোখে হেসে মিনতি বলল, 'ব্যোমকেশ বাবুর ঘরে গিয়েছিলে বুঝি লতিকা ?'

'বাজারের পয়সা দিয়ে এলাম বৌদি।'

'তোমার বাবা ওদিকে যে ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেল, শোননি ?'

হাসি শুকিয়ে লতিকার মনে ভয়ের চড়া দেখা দিল। 'তাই নাকি ! কই আমি ত কাঁসির শব্দ মোটে শুনতে পাইনি।'

মিনতি এবার ছুটো চোখই আধবোঁজা করল। 'শুনবে ভাই কোথা থেকে। নিচের ঘরে এতক্ষণ বাঁশি শুনছিলে।'

লতিকার মুখের ভয় রূপান্তরিত হল রাগে। বলল, 'তোমাদের এই ছু' মাস বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে বৌদি। দিয়ে দিও।'

এবার মিনতির মুখ শুকোনর পালা। হাঁড়িগলায় বলল, 'মেয়েমানুষ হলে কী হয়, তোমার মোটে মায়াদয়া নেই লতিকা। কবে বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে তোমাদের ? মাসপয়লায় বরাবর চুকিয়ে দিয়েছি। নেহাৎ এই ছুমাস তোমার দাদার প্র্যাকটিশের গতিক খারাপ, ঠাকুরপো বসে আছে—'

'আমাকে মিছে বলছ বৌদি। বাবা বলছিলেন, তাই।'

গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে মিনতি বলল, 'সব তাগাদা বুঝি আমাদের বেলা ভাই ? নইলে নিচের ঘরে ব্যোমকেশ এসেছে, এই চার মাস। এক পয়সা ভাড়া দিয়েছে আজ পর্যন্ত ? ওর বুঝি সাত খুন আর বাড়িভাড়া মাপ ? রাজকন্যার সঙ্গে বাড়ির একতলা ঘর ?'

লতিকা কী জবাব দিত বলা যায় না, কিন্তু ঠিক তখুনি আবার কাঁসি বেজে উঠল। লতিকা বলল, 'বাবা ডাকছেন আবার। আমি যাই বৌদি।'

আজ পাঁচ বছর ধরে বাতব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছে নিবারণ। প্রথম প্রথম প্রকোপটা এত মারাত্মক ছিল না পায়ের গিঁটগুলো শুধু কন কন করত। তারপর, ফী পূর্ণিমা একাদশী অমাবস্যায় জ্বর হতে থাকল। চিকিৎসা কবিরাজি দিয়ে শুরু হয়ে বৃত্তপথে ঘুরে ফের এসে ঠেকেছে কবিরাজিতে। ইতিমধ্যে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, হেকিম, অবধূত ইত্যাদিতে মিলে অন্তত খেয়েছে দু' হাজার টাকা। লাভের মধ্যে হয়েছে এই, আগে তবু লাঠি ভর করে ঘোরাঘুরি করতে পারত। এখন কোমরের নিচে সবটা অসাড়। সারাদিন বিছানায় চিৎ হয়ে কঁকায় আর মেয়েকে ধমকায়। গত বছর শীতে বুকে আবার কাশি বসেছে। গলাটা সেই থেকে ফ্যাঁসফেসে। মেয়েটা হয়েছে তেমনি, সারাদিন এদিকে ওদিকে, ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না; বাপের কাছে বসে না দুদণ্ড, মালিশ করে না। বকলে বলে শুনতে পাইনি।

সেই থেকে বিছানার কাছে অষ্টপ্রহর একটা কাঁসি রেখেছে নিবারণ। কোন কিছু দরকার হলেই বাজায়। ছুটে আসে লতিকা।

মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেখে চিঁ চিঁ করে নিবারণ বলল, 'তোর আক্কেল কি লতা। সারা সকাল কোথায় ছিলি? আমি উঠেছি সেই কখন, এখনও মুখ ধোবার মাজনটুকু পাইনি।'

লতিকা আস্তে আস্তে তুলে বসিয়ে দিল বাপকে। পিঠের বালিশ জড়ো করে দিল। মুখ ধোবার সরঞ্জাম এনে দিল হাতের গোড়ায়। তোয়ালে নিয়ে পিঠের কাছে দাঁড়াল।

মুখ ধুয়ে নিবারণ বলল, 'গরম দুধ দে।'

দুধ খেয়ে হৃষ্ট হল নিবারণ। তোয়ালে দিয়ে গোঁফের প্রান্তটুকু মুছে বলল, 'আয়না আন।'

কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে মুখখানা দেখল নিবারণ। বসে যাওয়া চোখ দুটির কোলের গভীরতা পরখ করল হাত বুলিয়ে। কানের কাছের পাকা চুল দুটি তুলতে পণ্ডশ্রম করে নিজেই অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠল। কণ্ঠার উদ্ধত হাড় দুটির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার। তারপর ফের শুয়ে পড়ল।

জানালার বাইরে নিমগাছটায় বসন্ত এসেছে, দেখতে দেখতে নিবারণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সবুজ পাতার সহস্র ওষ্ঠ দিয়ে রৌদ্রাসব পান করছে গাছটা। হালকা হাওয়ায় জানালা পর্যন্ত এগিয়ে আসা ডালটা দুলছে। নেশায় বুঁদ হয়ে টলছে যেন। নিবারণের আরেকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

যেদিন থেকে শরীরটা অচল হয়েছে সেদিন থেকে সে চিন্তাশীল হয়েছে। উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটা মৌল মিল আছে, এই দার্শনিক তথ্য আবিষ্কার করে নিবারণ একদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। মিল সব মানুষের না, তার নিজের, পক্ষাহত পঙ্গু মানুষের। নড়াচড়ার ক্ষমতা ত নেই ওই নিমগাছটারও। সে যেমন বিছানায়, ও-ও তেমনি একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মাটিতে। ঝড়ে ডাল ভাঙে, শীতে পাতা ঝরে, বার মাস পাখিতে ঠুকরে ঠুকরে ফল খায়, শুকিয়ে শুকিয়ে বাকল খসে। তবু বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে নতুন হয়ে বেঁচে ওঠে গাছটা.পাতায় ভরে যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল আসে; কম্প দিয়ে জ্বর আসার মত। অথচ বিধাতার একি পক্ষপাত, তার নিজের চোখের কালি মেলায় না কেন, চামড়া হয় না চিক্কণ, কণ্ঠা ভরে না, পাঁজরায় লাগে না মাংস।

ক্লান্ত হয়ে চোখ বুঁজে নিবারণ বলল, 'কাল আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি লতি।'

'কী স্বপ্ন বাবা ?'

বলতে গিয়ে চুপ করে গেল নিবারণ। মেয়েকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলা যায় না। নিবারণ স্বপ্ন দেখেছিল, ওই নিমগাছটার মত তারও যেন ফিরে এসেছে কান্তি, চোখে জ্যোতি, পায়ে বল। আর বুকের ঠিক কাছ ঘেঁসে শুয়ে আছে একজন, তার মাথায় ঘোমটা, শরীরের যেটুকু খোলা সেটুকু গৌরবর্ণ। স্বপ্নে মনে হয়েছিল সত্যি, নিবারণ ঘেমে উঠেছিল। জেগে উঠে বুঝেছে মিথ্যে। বিছানার পাশটা তেমনি খালি, পাশবালিশটা মালিশের তেলে দুর্গন্ধ। কণ্ঠা তেমনি বেরুনো, চোখ কোটরে লুকোনো। আবার দীর্ঘশ্বাস পড়েছে নিবারণের। বার্দ্ধক্যে শৈশব ফিরে আসে, কিন্তু সমস্ত জীবনেও দ্বিতীয় বার যৌবন আসে না।

'কী স্বপ্ন বাবা ?' লতিকা আবার জিজ্ঞাসা করল।

পক্ষাহত প্রৌঢ় একটি তরুণী নারীকে স্বপ্নে কামনা করেছিল। কিন্তু সে কথা বলা যায় না বয়স্থা মেয়েকে। নিবারণ বলল, 'দেখলাম তোর মা এসেছে। সেই চওড়া লালপাড় শাড়ি, বরাবর যেমন পরত। তোর মনে নেই ? এসে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।'

লতিকা ছল ছল চোখ করল।

'তোমার ওষুধটা নিয়ে আসি ?'

একটা করুণ প্রসঙ্গ এত শীগ্‌গির শেষ হতে দিতে নিবারণের ইচ্ছে ছিল না। নাক দিয়ে বলল, 'ওষুধ আমি আর খাব না লতি। কিছু হয় না—সব শালা জোচ্চোর। টাকা খাওয়ার ফন্দী।' হাত দু'টো প্রসারিত করে ধরল নিবারণ। তাবিজ মাদুলীর দাগে দাগে কনুই থেকে আধলাপ্রমাণ টীকের শুকনো চিহ্ন পর্যন্ত সারি সারি শ্বেতবলয়রেখা—কোমরে কসির দাগ যেমন গভীর হয়ে পড়ে।

আর খাব না। কোন শালার কথা শুনব না। ওদের পরামর্শে আমি যাই নি বিদেশে? সাত সাতটা গরম জলের কুণ্ডতে স্নান করিনি, বাত সারবে বলে? সেরেছে? ফুঃ! মাঝখান থেকে কতগুলো রেলভাড়া গচ্চা গেছে।'

লতিকা বলল, 'যাই বাবা। বাজারটা নিয়ে আসি।'

ঘড় ঘড় শব্দ করে নিবারণ বলল, 'ওই জুটেছে আর এক শালা ব্যোমকেশ। ব্যাটার বাড়িভাড়া দেবার নাম নেই।'

লতিকা বলল, 'দিয়েছেন ত বাবা। ও-মাস পর্যন্ত সব শোধ করে দিয়েছেন।'

অবিশ্বাসী চোখ হু'টো ছোট করে নিবারণ বলল, 'কত দিয়েছে, কবে দিয়েছে শুনি?'

'বাঃ রে, সেই যে সেদিন বিশ টাকা এনে রাজমিস্ত্রীকে দিলুম, ও-টাকা তো ব্যোমকেশবাবুরই দেওয়া। তোমার কিছু মনে থাকে না বাবা।'

মেয়ের আঁচলেই চাবি। জোর করে আর কিছু বলতে পারল না নিবারণ। তবু খুঁতখুঁত করতে থাকল। 'বিশ টাকা, বিশ টাকা! আমার বাপের গুরুঠাকুর এসেছেন। সদর রাস্তার ওপর ঘর, ওটা ভাড়া দিলে কোন্ না চল্লিশটা টাকা হত। সেলামীই পাওয়া যেত চারশো। আজকাল আমার আয় নেই। এই বাড়িভাড়ার টাকা কটাই ভরসা। তুই কিছু বুঝিস না লতি।'

বোঝে লতিকা, খুব বোঝে। কিন্তু মন বোঝে না যে।

খেতে বসে নিবারণ আরেক দফা গজ গজ করল। 'এই মাছ আর এইটুকু মোটে তরকারী? আজ বাজারে ক'টাকা খরচ হয়েছে? হু'টাকা? হুটি প্রাণীর তো মোটে খাওয়া, হু'টাকা কিসে লাগে লতি?'

লতিকা হিসেব দিতে যাচ্ছিল, 'মাছ চোদ্দ আনা, আলু ছ'আনা, পটল—'

বিশ্বাস করল না নিবারণ। মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'উঁহু। ব্যোমকেশ শালা নিশ্চয় পয়সা চুরি করেছে।'

ভেবেছিল চুপে চুপে কাগজটা দেখেই চলে আসবে, পারল না। লতিকা টেরও পায়নি কখন মিনতি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আনন্দবাজারে এমন তন্ন তন্ন করে কী খুঁজছ ভাই?'

ত্রস্ত লতিকা তাড়াতাড়ি পাতাটা উল্টে ফেলল। 'কিছু না বৌদি। দেখছিলাম কোন সিনেমায় কী বই হচ্ছে। প্রেমকুমারীর নতুন ছবিটা দেখেছ, আজ পাঁচ হপ্তা ধরে নাকি হাউস ফুল যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে নাকি।' মিনতি ওর কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল। মিষ্টিমিষ্টি হেসে বলল, 'কিন্তু তুমি তো প্রেমকুমারীর ছবি দেখছিলে না, ভাই, দেখছিলে চিকুরিকার বিজ্ঞাপন। 'টাকে ও চুল পড়ায় অব্যর্থ—ফ্রেণ্ডস কেমিক্যালের চিকুরিকা,—ঠাকুরপো সকালে যেটার কথা বলেছিল, না?'

ডাঁন বৌটার পেটে পেটে শয়তানী। অপ্রতিভ গলায় লতিকা বলল, 'মাইরি বৌদি, না।'

'ঢাকছ কেন ভাই। লজ্জার কি আছে। সত্যিই ত টাকটা সারানো দরকার। মুখশ্রী এমনিতে তো তোমার কুচ্ছিৎ নয়, নেহাৎ চাঁদি বেরিয়ে পড়েছে তাই। নইলে বিয়ে হয়ে যেত।'

অপমান না প্রশংসা বুঝতে না পেরে লতিকা বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি এখন আসি বৌদি। নির্মলদা আবার কখন এসে পড়বেন।'

'ব'স ব'স। ঠাকুরপোর বয়ে গেছে আসতে। এগারটার আগে বাবুর তাস পেটা সারা হলে ত।'

কৃত্রিম নয়, দেওরের ওপর আক্রোশটা মিনতির খাঁটি। অকর্মণ্য পুরুষ মানুষ, ত্রিশের কাছাকাছি বয়স গেল, এখনও একপয়সা আনবার নাম নেই ঘরে। দিব্যি তাস পিটে, সিগারেট ফুঁকে চালাচ্ছে। তা চালাক, চাকরি এ-বাজারে জোটান শক্ত। এদিকে টেড়ি বাগাচ্ছে দিনরাত, কিন্তু বাড়িওয়ালার এই টেকো, পেত্নীর মত মেয়েটাকে বাগানোর মুরোদও যদি থাকত। প্রেম না হ'ক, ফষ্টিনষ্টি একটু; মন-ঢালাঢালি না হ'ক, গা-ঢলাঢলি। অথচ কেমন ওস্তাদ এই ব্যোমকেশ ছোঁড়াটা, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। চাকরি-বাকরি তো ওরও নেই। তবু কেমন এই ছুঁড়িটার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে বাড়ি-ভাড়াটা মকুব করে নিচ্ছে। এটুকু সাশ্রয়ও যদি অপদার্থ নির্মলটাকে দিয়ে হত।

শুধু তাই না।

মিনতির দৃঢ় বিশ্বাস লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যোমকেশকে ডালভাত-তরকারীও যুগিয়ে যাচ্ছে লতিকা। বেতো রুগী বাপ, চোখে ত দেখে না কিছু।

লতিকা আবার বলল, 'আমি উঠি বৌদি। বাবা ডাকছেন হয়ত।'

মিনতি ওর হাত ধরে টেনে রাখল, 'কাঁসি বাজেনি, আমি সেদিকে কান রেখেছি।'

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস রহস্যে বলল, 'এখন কোথায় যাবে আমাকে ছুঁয়ে বলত ভাই। ব্যোমকেশ বাবুর ঘরে, না ?'

পাংশুমুখে লতিকা বলল, 'আমি বুঝি এত রাত্তিরে ও ঘরে কখনও যাই বৌদি ?'

মিহি-মিঠি সুরে মিনতি বলল, 'সেই ভাল ভাই, যেয়োনা। কে জানে, কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে। আমরা না হয় চেপে

গেলুম অন্য লোকের কথা তো বলা যায় না। মানুষের মন তো, পাঁচরকম হয়ত রটাবে।'

লতিকার মুখখানা দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে ব্যোমকেশ বলল, 'লতা লতে লতা, তোমার জন্যে কি করতে পারি লতে।'

ব্লাউজের ভেতর থেকে সন্তর্পণে একটুকরো কাগজ বার করে লতিকা বলল, 'এই তেলটা কিনে আনতে হবে লক্ষ্মিটি।'

'কী তেল, দেখি।' বিজ্ঞাপনটা ব্যোমকেশ পড়ল ভুরু কুঁচকে। 'দূর দূর, যত সব চালাকি।'

'না, না, চালাকি নয়।' বিজ্ঞাপনে পাশাপাশি একটি সুকেশা ও একটি বিরলকেশার ছবি ছাপা হয়েছিল, লতিকা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

ব্যোমকেশ হাসতে শুরু করল। 'আমার লতা লতে লতা, ছবিটা কোন ব্যবহারকারিণীর নয়, কোম্পানীর লোকের আঁকা।

'তা-হোক', লতিকা বলল, 'আনা চাই-ই। টাকা আমি দিচ্ছি।' বলে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল ব্যোমকেশের হাতে।

ব্যোমকেশ বলল, 'আমার লতা এমনিতেই সুন্দর।'

ওর বুকে মুখ গুঁজে লতিকা বলল, 'ছাই সুন্দর। আমি যেন কিছু বুঝতে পারি না, না? রোজ অন্তত চুল উঠছে দুশো করে। চিরুণী চালাতে ভয় করে, মাথায় জট পড়ল। কী-যে যন্ত্রনা; তুমি কি বুঝবে।'

আবেগে চোখ বন্ধ করল ব্যোমকেশ। পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়তে নাড়তে বলল, 'বুঝি, লতা, বুঝি। কী করি, চাকরিই একটা জোটাতে পারি না যে। নইলে তোমার জন্যে একটা তেল, সে-টাকাও কিনা আমাকে হাত পেতে নিতে হল।'

বালিশের নীচে থেকে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ টেনে নিয়ে ব্যোম-কেশ বলল, 'লড়াই থেকে যা নিয়ে ফিরেছিলাম, সব ফুরিয়ে গেছে কবে। ভাগ্যিস তুমি দয়া করেছিলে, তাই মাথা গোঁজার একটা জায়গা মিলেছে, দুটো খেতে পরতে পাচ্ছি। বাস কণ্ডাক্টরি থেকে উকিলের টাউট—যা হ'ক একটা কিছু জুটে গেলেও বেঁচে যেতাম।'

'কাগজটা কিসের।'

'একটা দরখাস্ত। রোজই তো একটা দু'টো পাঠিয়ে দিচ্ছি বরাত ঠুকে। জবাবই আসে না যে।'

'তুমি চাকরি করবে?'

বিস্মিত ব্যোমকেশ বলল, 'করব না?'

'কেন'? উদ্বেল গলায় লতিকা বলল, 'কিসের দুঃখ তোমার? কেন, চাকরি নিয়ে এখান থেকে পালাতে চাও তুমি? আমি কুচ্ছিৎ, আমার চুল নেই, এই তো?'

ওর গালে আদরটোকা দিয়ে ব্যোমকেশ বলল, 'ছি ছি! কী ভাবো তুমি আমাকে। পালাব কেন, আর পালাই যদি তোমাকে নিয়ে যাব।'

কানকে বিশ্বাস নেই তাই লতিকা হাসিকান্না মুখখানা তুলে ধরল।—'সত্যি?'

ব্যোমকেশ বলল, 'তিন সত্যি।'

কিন্তু যেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লতিকা, ব্যোমকেশ একটা আশ্চর্য কাণ্ড করল। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল কেশতেল বিজ্ঞাপনের কাটিংটা, টুকরোগুলো জানালা দিয়ে ছড়িয়ে দিল।

নির্মল বলল, 'এই সাবানকোম্পানীর এজেন্সী নিয়েছি লতিকা। দশ পার্সেন্ট কমিশন। কিনবে তুমি? কেনোনা, তোমার হাতেই বউনি হ'ক।'

গন্ধ শুঁকে লতিকা বলল, 'ছাই সাবান। ভাল না।'

'বললেই হল। এই দেখ না, আমি চান করেছি কখন, সেই এখনও গন্ধ ভুরভুর করছে।'

'আপনি বুঝি খুব সাবান মাখেন নির্মলবাবু?'

'মাখিই তো। তুমি মাখো না?'

'না। কী হয় শাবান মাখলে?'

'ফর্শা হয়।'

লতিকা বিশ্বাস করল না। বলল, 'ঈস।'

'তোমার বুঝি সাবান মেখেও কিছু হয়নি লতু?'

'বলেছি না, লতু-লতু করবেন না।'

'কী বললে খুশি হবে তবে। ব্যোমকেশের মত তু-তু করলে?'

কালো হয়ে গেল লতিকা। তবু ভাবনার নখ দিয়ে মন খুঁড়ে খুঁড়েও একটা জুৎসই জবাব দিতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'আপনি শুধু অভদ্র নন নির্মলবাবু, ইতর।' দুম দুম করে পা ফেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

পেছন থেকে ডেকে নির্মল বলল, 'আরে শোন শোন। আসল কথাটাই তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। কাল সকালে তোমার ব্যোমকেশবাবুকে একটা খারাপ পাড়ায় দেখলাম লতিকা।'

তীব্র একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লতিকা বলল, 'আপনিও নিশ্চয় খারাপ পাড়ায় যান নির্মলবাবু, নইলে দেখলেন কী-করে।'

নিচে থাকলে ওপর তলার কাঁসির শব্দ শুনতে পায় না লতিকা, কিন্তু ওপর থেকে নিচের ঘরের দরজার তালা খোলার শব্দ শুনল ঠিক। পা টিপে টিপে নেমে এল নিচে। আজ সারা দিনমানে অন্তত বার তিনেক নিচের ঘরে লতিকা উঁকি দিয়ে গেছে, ব্যোমকেশকে ধরতে পারেনি।

পা-জামা ছেড়ে ব্যোমকেশ লুঙ্গিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, লতিকা বলল, 'কই দাও।'

যেন চীনা ভাষা শুনছে এমন ভাবলেশহীন চোখে ব্যোমকেশ চেয়ে রইল। লতিকা বলল, 'বা-রে আননি তুমি তেল ?'

অবিন্যস্ত চুলগুলো পেছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে ব্যোমকেশ বলল, 'ওই-যা। একদম ভুলে গেছি। আজ সারাদিন কী-যে ঘোরাঘুরি, হয়রানি গেল লতা, কী বলব।'

লতিকার পাণ্ডুর হাতখানা ওর হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ফের বলল. 'যাক, একটা সুখবর আছে। এতদিনে একটা চাকরি পেতেও পারি বা। আজ ইন্টারভিউ ছিল। মাইনে বেশি না, আপাতত আশি। তবু, বসে থাকার চেয়ে ভাল। মনে তো হল, ওদের আমাকে পছন্দ হয়েছে। বিলিতি কোম্পানী কিনা, লড়াইয়ে গেছলুম শুনেই কাৎ।'

লতিকা চুপ করে ছিল। ব্যোমকেশ বলল, 'আনন্দ হচ্ছে না তোমার ?'

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল লতিকা। বলল, 'হচ্ছে।'

পর দিনও তেলটা আনতে ভুলে গেল ব্যোমকেশ। জিভ কেটে বলল, 'ওই যা। আবার ভুলেছি। কাল ঠিক আনব। কী যেন নামটা বলেছিলে তেলটার ?'

লতিকা বলল।

'কোম্পানী ?

'তা-তো মনে নেই। তোমাকে তো কাটিঙ দিয়েছিলাম একটা, সেটা কই।'

পাঞ্জাবির নিচ পকেট, বুক পকেট, ঘড়ির পকেট তন্নতন্ন করে খুঁজল ব্যোমকেশ, চিরকুটটা পাওয়া গেল না কোথাও।

তবু দমল না লতিকা। কোথা থেকে পরদিন আরেকটা কাটিঙ এনে দিল।—'এবার আনতে পারবে ?'

'আলবৎ।' ব্যোমকেশ বলল, কিন্তু একটু পরেই বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে লজ্জার কথা কী বলব লতা, সেই যে টাকাটা এনে দিয়েছিলে না, সেটা খরচ করে ফেলেছি !'

'স—ব ?'

'খুচরো কিছু থাকতে পারে। সারা দিন ঘোরাঘুরি, হাঁটাহাঁটি, কী খিদে পায় যে।'

লতিকা বিনা বাক্যব্যয়ে উপরে উঠে গেল, একটু পরেই ফিরে এল আরেকটা পাঁচটাকার নোট হাতে নিয়ে।

বলল, 'এবার ?'

ওকে কোলে নিয়ে ব্যোমকেশ শূন্যে তুলে ধরল। বলল, 'এবারে ঠিক আনব। ভাল কথা, আমার নামে কোন চিঠিপত্র আসেনি লতা ?'

মাটিতে নেমে লতিকা বলল, 'কই না তো।'

চিন্তিত গলায় ব্যোমকেশ বলল, 'আজ কালের মধ্যেই আসবার কথা ছিল যে। তাই তো, চাকরিটা হবু-হবু করেও ফসকে না যায়।'

পরদিন দুপুরে, কেউ যখন বাসায় নেই, সদরে কড়া বেজে উঠল। লতিকা তরতর করে নেমে এল নিচে। তকমাআঁটা সাইকেল পিওন বলল, 'চিঠি আছে, ব্যোমকেশ সামন্ত।'

'বাসায় ত নেই।'

পিওন বলল, 'আপনি সই করে রেখে দিন।'

সই করতে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল লতিকার; কী চিঠি কে জানে। পিওন চলে যেতেই ফরফর করে ছিঁড়ল খাম।

যা ভেবেছিল তাই। অল্পসল্প ইংরিজি বিদ্যে যা ছিল, তাই দিয়েই বুঝতে পারল, এ-চিঠি সেই আফিসের যেখানে ব্যোমকেশের চাকরির কথা হচ্ছে।

উপরে গিয়ে ঠেলে তুলল নিবারণকে।—'কী চিঠি, একটু পড়ে দাও তো বাবা।'

বিদ্যা নিবারণেরও ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত। তবু মর্মোদ্ধার করল কোন রকমে। ম্যাকিন্‌লি কোম্পানীর চাকরিটা হয়েছে ব্যোমকেশের। আগামী কালই জয়েন-তারিখ।

চিঠিটা ফেরৎ দিয়ে নিবারণ বলল, 'জরুরি চিঠি। এলেই দিয়ে দিস। এবার থেকে ওর কাছ থেকে কানে ধরে ভাড়া আদায় করবি লতি, শালার কোন ওজর শুনবি না।'

বারান্দায় বেরিয়ে এল লতিকা। চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরল। বিচিত্র একটু হাসি ফুটল মুখে। তারপর চিঠিটাকে বক্ষকূপে নিক্ষেপ করল।

সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরে ব্যোমকেশ ডাকবাক্সটা হাতড়াল। বলল, 'আমার কোন চিঠিপত্র আজও আসেনি লতা?'

অম্লান মুখে লতিকা বলল, 'না।' একটু থেমে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার তেল?' জবাব দিতে ডবল সঙ্কোচ হল ব্যোমকেশের। বড়বাজারের বাঁশতলা গলিতে টাকাটা যে আজ পকেটমার গেছে, একথা লতিকাকে বলবে কোন্‌ মুখে।

দিন সাতেক পরে একদিন ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বিকেলের দিকে বাসায় ফিরল। ভেতরের উঠোনে লতিকা কী যেন বলছিল মিনতিকে। ওর দরজায় চৌকাটে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ বেশ জোর গলাতেই ডাক দিল, 'লতিকা, একটু শুনে যাও ত।'

মিনতি মুখ টিপে হেসে বলল, 'যাও, তলব এসেছে। বোধহয় ভাড়ার টাকা দেবে।'

মুখরা এই বৌটার মুখে বিষ, মনে বিষ। কিন্তু লতিকার তখন জবাব দেবার ফুরসুৎ নেই।

লতিকা ঢুকতেই ব্যোমকেশ দড়াম করে দরজাটা দিল বন্ধ করে, থুথুরে বাড়ি, থথর কেঁপে উঠল মিনতি। কৌতূহল সামলাতে পারল না, জানালার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক ছিল, পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে সেখানে চোখ রাখল।

ব্যোমকেশ শক্ত করে ধরে রেখেছে লতিকার হাতের কবজি। সারা দুপুর রোদেঘোরা ঘোলাটে চোখ জ্বলছে। 'আমার নামে কোন চিঠি এসেছিল,—ধরো দিন আষ্টেক আগে?'

'কই, না।'

ব্যোমকেশ ওর হাতটা মুচড়ে দিল কিনা মিনতি বুঝতে পারল না, কিন্তু লতিকাকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠতে শুনল।

কর্কশ গলায় ব্যোমকেশ বলল, 'এসেছিল। আমার চাকরির চিঠি। সে-চিঠি সই করে রেখেছ তুমি।'

মশমশ জুতো পায়ে নির্মল তক্ষুনি বাড়ি ফিরছিল। মিনতি ঠোঁটে তর্জনী রেখে ওকে ইশারা করলে, 'চুপ'। হাতছানি দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে বললে।

ব্যোমকেশ তখন বলছে, 'রোজ আমি বসে বসে ভাবি কখন আসে চিঠি। শেষে আজ আপিসে খোঁজ নিতে গেছলুম। 'ন' দিন আগে ইস্যু হয়েছে চিঠি। ওরা আমাকে পিওন বুক খুলে তোমার সই দেখালে। অন্য নাম লিখেছ, কিন্তু হাতের লেখা আমি চিনিতো। সাতদিন আগে আমার জয়েনিং ডেট ছিল, তবু ওরা ক'দিন অপেক্ষা করেছে। নতুন লোক নিয়েছে মাত্র কাল।'

নির্জীব লতিকা মাটির দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ ওর হাত ছেড়ে দিয়ে তক্তপোষে বসে পড়ল ব্যোমকেশ। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, 'কেন আমার এমন সর্বনাশ করলে লতিকা? আজ ছমাসের ওপর কাজ কর্ম নেই, তোমাদের অন্নদাস হয়ে আছি, দিনরাত হাঁটাহাঁটি করে যদি বা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার একটা ব্যবস্থা করলাম তাও ঘুচিয়ে দিলে? কেন এমন কাজ করলে—কেন, কেন? এই তোমার ভালবাসা?'

'হাঁ এই।' আঁচলটা কুড়িয়ে নিল লতিকা. বিপর্যস্ত চুল সরে গিয়ে মাথার সমুখের দিকের টাকটা বেরিয়ে পড়েছে ভ্রুক্ষেপ নেই, স্পষ্ট গলায় বলল, 'হাঁ, এই আমার ভালবাসা। তোমার কথা এতক্ষণ বলেছ, এবার আমার কথা বলি।' লতিকার গলা রুদ্ধ হয়ে এল,—'আমার সব চুল উঠে যাচ্ছে, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না, তবু গত একমাস ধরে বলে বলে তোমাকে দিয়ে একটা তেল আনাতে পারলুম না? দু'দুবার টাকা দিয়েছি, বিজ্ঞাপনের টুকরোটা জোগাড় করে দিয়েছি তোমাকে। তবু তুমি আননি।'

'সে কাটিং তো আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।' নিস্তেজ গলায় ব্যোমকেশ বলল।

'মিথ্যে কথা।' এবার উচ্চতর হল লতিকার কণ্ঠ।—'তোমার বিছানা ঠিক করে দিতে এসে সেদিন বালিশের নিচে দ্বিতীয়টা পেয়েছি আমি। এটাকে বোধ হয় বাইরে ফেলে দিতে ভুলে গিয়েছিলে?'

ব্যোমকেশ কী মিনমিনে কৈফিয়ৎ দিল শোনা গেল না। একটু পরে বলল, 'অন্য কাউকে দিয়েও তো আনিয়ে নিতে পারতে তুমি।'

'পারতাম, কিন্তু তুমি থাকতে অন্য লোকের খোসামোদ করতে যাব কেন? এবারে হয়ত তাই করতে হবে।' বলতে বলতে হাঁটু

ভেঙে বসল লতিকা, ব্যোমকেশের হাত দুটি চেপে ধরে বলল, 'আমাকে কুচ্ছিৎ রেখে তোমার কী লাভ বল ত?'

ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে ব্যোমকেশ বলল, 'ঘরে যাও লতা।'

চোখের ইশারায় মিনতি নির্মলকে ঘরে যেতে বলল, নিজেও এল পিছে পিছে।

ঘরে এসে সিগারেট ধরিয়ে নির্মল বলল, 'দেখলাম ওদের ভালবাসার দৌড়। আমার বরাবর ধারণা ছিল, কোথাও না কোথাও একটা ফাঁকি আছেই।'

'ছাই বুঝেছ তুমি,' মিনতি বলল, 'নইলে পুরুষের বুদ্ধি আর বলেছে কেন।'

নির্মল চেয়ে রইল।—'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ মেয়েটার পেটে পেটে বুদ্ধি। জানে তো নিজের এই হতচ্ছিরি চেহারা, নেহাৎ দুটো খেতে দিচ্ছে বলেই লোকটা ওর দিকে চোখ তুলে চাইছে। চাকরি পেলেই শিকলি কেটে উড়বে চিড়িয়া, ওই টেকো মেয়ের সঙ্গে পীরিত করতে তখন ওর বয়ে যাবে। ওকে ধরে রাখার মন্দ ফিকির বার করে নি ছুঁড়িটা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা ঠাকুরপো, লোকটা ওকে চুলের তেলটা কিছুতে এনে দেয়নি কেন!'

সিগারেটে পরিপূর্ণ একটা টান দিয়ে নির্মল ছাই ঝাড়ল, 'সেটা আমি হয়ত বলতে পারি। লোকটা বোধ হয় ভেবেছে, নেহাৎ টাকমাথা বলেই মেয়েটার বিয়ে হচ্ছেনা। বলা তো যায়না, যদি তেলটেল মেখে মাথায় চুল গজায়, তখন একটু-না-একটু শ্রী তো খুলবেই। টাকা আছে, বিয়েও হয়ে যেতে পারে। ভাল ঘরবরে পড়তে পারলে ওর মত

চাল-চুলোহীন লোকটার দিকে ফিরে চাইতে বয়ে যাবে মেয়েটার, সোজা গিয়ে পাল্কি চেপে বসবে, ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে ভাতও ঘুচে যাবে লোকটার। পথে দাঁড়াতে হবে। তার চেয়ে বাবা, টাক আছে থাকুক, মেয়েটা তো ঘরে থাকুক।'

আঁচলে হাসি চাপা দিয়ে মিনতি বলল, 'তা হোক। যাই বল বাপু, ওরা দু'জনে দুজনকে ভালবাসে কিন্তু।'

নির্মল স্বীকার করল। বলল, 'বাসেই তো। বোধহয় একটু বেশি বেশিই বাসে। আর, ভালবাসে বলেই ভাল চায় না।'

ঘর

মানবচরিত্রের, তাস শাফল্ করতে করতে ডাঃ চৌধুরী বললেন, আপনারা কিছুই জানেন না।

আলোচনা উঠেছিল হরগঞ্জ হত্যা মামলার রায় নিয়ে। দ্বিতীয় রাবার যখন ক্লোজ হবার মুখে মুখে, বিলাসবাবু এসে সান্ধ্যদৈনিকের একটা কপি টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, হরিশ নায়েবের ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

—আর গিরিবালার? সকলে উৎসুক প্রশ্ন করল।

—কিছু না। বিনা প্রমাণে, কিংবা যথেষ্ট প্রমাণাভাবে, খালাস পেয়েছে।

খালাস পেয়েছে? অথচ নায়েবটা তো নিমিত্ত মাত্র? তার ফাঁসির হুকুম হ'ল, আর গিরিবালা, যে আড়াল থেকে কলকাঠি টিপলে, সে খালাস পেয়ে গেল?

—আরে, ভাই, প্রমাণাভাবে ঈশ্বরশুদ্ধ অসিদ্ধ হয়ে যান, আর এ তো—

বিলাসবাবু বললেন, পৃথিবীতে দু'জাতের নারী আছে। এক, যাঁরা গড়েন। দুই, যাঁরা ভাঙেন।

—সেই রবীন্দ্রনাথ যাকে লক্ষ্মী আর উর্বশী বলেছেন?

—অতো জানিনে ভাই। তবে দু'নম্বরের যাঁরা, তাঁরা হলেন সর্বনাশী। এদের আগুনে সংসার তো সংসার, রাজ্যশুদ্ধ ছারেখারে গেছে, যুগে যুগে এই ঘটেছে।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণে নিবিষ্টমনে তাস ভাঁজছিলেন, মাথা তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, মানবচরিত্রের আপনারা কিছুই জানেন না।

—কেন, কেন?

—কেন আবার কী। আপনারা মানুষকে বড়ো অসম্পূর্ণ করে দেখেন। একটু জেনেই বলেন 'সব জেনেছি'; একটু চেখেই 'সব খেয়েছি' বলার মতো। গিরিবালার বয়স কম। বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল। লোভও আকাশ ছুঁয়েছিল সেই সঙ্গে। নায়েবকে হাত করে সৎছেলেকে খুন করালো এই আশায় যে, গোটা সম্পত্তি হাতে আসবে। মামলার বিবরণ থেকে এইটুকু মাত্র আপনারা আঁচ করেছেন। এ থেকেই আপনারা ধরে নিলেন, গিরিবালা সেই ঘরভাঙা দলের মেয়েমানুষ, বিলাসবাবু যাকে বলেছেন, উর্বশী বা সর্বনাশী। কিন্তু একথা আপনাদের মনে এলো না কেন যে, নদী শুধু এক পার ভাঙে না, আরেক পার গড়েও?

—অর্থাৎ?

—অর্থ আর করতে পারিনে। আমি যা বলতে চাইছি, ডাক্তার চৌধুরী বললেন, সেটা আরেকটু স্পষ্ট করার জন্যে বড়ো জোর একটা গল্প আপনাদের শোনাতে পারি।

গল্প? সকলে উৎসুক চোখে তাকালো। নীরদ, যে ডামির বিবি দিয়ে ডান হাতের সাহেবকে ফাঁদে ফেলবে বলে হাত বাড়িয়েছিল, সে শুধু কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। বললে, রাবারটা শেষ হবে না? দু'টো সাইড্ই এখন ভাল্নারেব্ল রয়েছে—

বিলাসবাবু ধমক দিয়ে বললেন, কাশীরাম দাস যখন বলেন তখন পুণ্যবান মাত্রে চুপচাপ শুনে যায়।

গল্পটা ঠিক কোথায় আরম্ভ করব, ডাক্তারবাবু বললেন, ঠিক বুঝতে পারছিনে। লেখা গল্পের সুবিধে এই যে তাতে ঘটনা ইচ্ছেমত সাজিয়ে নেওয়া চলে। আগের ঘটনা পরে, এবং পরের ঘটনা মাঝে,

যা খুশি অদলবদল করা চলে। কিন্তু বলা গল্পের কথকের এ-স্বাধীনতা নেই। ঘটনাপারম্পর্য ঠিক না থাকলে গল্পের খেই থাকে না।

শুনে হাসবেন না, আমিও এক সময় সাহিত্যচর্চা করতুম। কথাটা আগে থেকে বললুম এইজন্যে যে আপনাদের ধারণা লোকটা রুগীর নাড়ি টিপে খায়, যন্ত্র বসিয়ে পরের হৃদয় পরীক্ষা করে, ওর নিজের হৃদ্‌যন্ত্র বলে কিছু নেই। বয়স্ তখন অল্প ছিল, শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোরই ফাংশন রেগুলার ছিল, মাঝে মাঝে কেবল বিকল হ'ত হৃদয়টিই। যখনকার কথা বলছি, তখন বোধ করি মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি; রোগী, রোগিনী, পথচারী—প্রতিবেশী, সকলেরই মধ্যেই গল্পের উপাদান খুঁজি। এমনই সাহিত্যরসিক হয়ে উঠেছিলাম তখন যে, নীরস চিকিৎসাশাস্ত্রের হোম্‌টাস্‌ক করবার এক্সেরসাইজ বুকটার নাম দিয়েছিলাম চার-ইয়ারী খাতা। এই সময়েই কৃষ্ণকুন্তলাকে আমি প্রথম দেখি।

—কৃষ্ণকুন্তলা? বিলাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। অদ্ভুত নাম তো।

হ্যাঁ। অবশ্য নাম আমি জেনেছি কিছু পরে। আমাদের বাসাটা ছিল একটা গলির মধ্যে। একটু সামনেই সদর রাস্তা। গলি আর সদর রাস্তাটা যেখানে মিশেছে, ঠিক সেখানেই মেয়েদের হস্টেল ছিল। উহুঁ, অতো সরে এসে লাভ নেই নীরদ, গল্পটা মেয়েদের হস্টেল নিয়ে নয়।

রাস্তার দিকে যে ঘর, সেখানে আমি আর আমার এক মামাতো ভাই প্রফুল্ল থাকতাম। প্রফুল্ল তখন এম, এ, পড়ে। আমরা দু'জনেই সাহিত্য সম্পর্কে সমান উৎসাহী। মুখে মুখে গল্প বানাই। কখনো বা পত্রিকায় পাঠাই। একই সঙ্গে প্লট বুনি।

একদিন বিকেলে ডিসেক্‌সন ক্লাশের শেষে ঘরে এসে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছি, এমন সময়, প্রফুল্ল এসে আমাকে টেনে তুলল।

—কী ব্যাপার ?

—দেখই না এসে। প্রফুল্ল আমাকে জানালার কাছে টেনে নিয়ে এলো। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, আকাশে তারা ফুটছে একটি দু'টি করে, রাস্তায় একটি দু'টি করে গ্যাসের বাতি। প্রফুল্ল কি আমাকে রাজসড়কের সন্ধ্যার সৌন্দর্য দেখাতে নিয়ে এলো ?

—দেখতে পাচ্ছিস ?

ভালো করে চোখ রগড়ে বললাম, কী ?

—এই অবজারভেশন নিয়ে তুই লেখক হবি ? প্রফুল্ল ঠাট্টা করে বললে, দেখতে পাচ্ছিস না, গ্যাসপোস্টের নিচে, স্টার থিএটারের বিজ্ঞাপন আঁটা দেয়ালের পাশে ?

দেখলাম বটে। একটি মেয়ে চঞ্চল পায়ে ঘোরাঘুরি করছে, মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক চকিত চোখে তাকাচ্ছে। বয়স কত, অস্পষ্ট আলোয় এত দূর থেকে ঠাহর করা গেল না, তবে, একেবারে কচি খুকিটি নয় বলেই মনে হ'ল।

—কী বুঝছিস ?

—বোঝবার কী আছে। দেখার জিনিস, দেখলুম।

প্রফুল্ল চটে গিয়ে বলল, এই কল্পনাশক্তি নিয়ে তুই আবার লেখক হবি ? বুঝতে পারছিস না, ও কারুর অপেক্ষা করছে ?

দু' দু'বার আমার সাহিত্যমেধা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করায় প্রফুল্লর ওপর যৎপরোনাস্তি চটে গিয়ে বললুম, প্রতীক্ষা, না ঘোড়ার ডিম। ও নিশ্চয় ট্রামের অপেক্ষায় আছে।

—সার কথা বুঝেছিস। ট্রামের জন্যে লোকে স্টপেজে দাঁড়ায়, গলির ভেতরে ঘুরঘুর করে না। ওই দেখ।

দেখি তাইতো। কখন একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে, মেয়েটির পাশে। ওরা সরে গেছে আরো একটু কোণে, দেবদারু গাছের ছায়ায়।

চট করে পাঞ্জাবিটা পরে প্রফুল্ল বললে, আয়।

—কোথায় ?

—মোড়ের দোকান থেকে পান কিনবি। ওদের কাছে থেকে দেখাও হবে।

মনে মনে প্রফুল্লর বুদ্ধির,—অন্তত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের, প্রশংসা না করে পারলুম না। মোড়ের দোকান থেকে দু'জনে মিঠে পান খেলাম। এমন সময়, আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, লোকটাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে এক বাক্স পাশিং-শো ফরমাস করল। আমরাও লোকটাকে ভালো করে দেখে নেবার সুযোগ পেলাম। কালো রঙ অনেক দেখেছি, আমি নিজেও কিছু তপ্তকাঞ্চনকান্তি নই,—কিন্তু কালো রঙে যে এত ক্লেদ ফুটে উঠতে পারে, সেটা আগে কখনো মনে হয়নি। পানের দোকানের আয়নায় ছায়া পড়েছিল। চোয়াড়ে মুখ, উঁচু গণ্ডাস্থি, চোখ দু'টো ঘিরে কালিমার অর্ধচন্দ্র। কর্কশ, খোঁচা-খোঁচা গোঁফওয়ালা এই লোকটাকে কিছুতেই আমাদের কল্পনার প্রেমিকের সঙ্গে মেলাতে পারলুম না।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, মেয়েটি একটু পিছনে আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

—পান খাবে ? সম্ভবত তাকে উদ্দেশ করেই লোকটা বললে।

—না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি চলে এসো।

সেই প্রথম তার গলা শুনলুম। অস্থির কণ্ঠ, কিন্তু ভারি মিহি। বোধ হয় লোকটার ভারি গলার ঠিক পর-পর শুনলুম বলেই অতোটা মিষ্টি লাগল।

আর দাঁড়ানো ভালো দেখায় না। আমরা আস্তে আস্তে সরে এলাম। মনে হ'ল দেবদারু গাছের ছায়ায়, অন্ধকারে, লোকটা মেয়েটির একখানা হাত হাতে তুলে নিল।

রাত্রে শুয়ে প্রফুল্ল বললে, ওদের নিয়ে মনে মনে আমি একটা গল্প দাঁড় করিয়েছি। তুই পারিস নি ?

বললাম, না ভাই। আমার কল্পনাশক্তি একটু খাটো জানিসই তো। তাছাড়া লোকটার পাশে মেয়েটিকে ভাবতেই পারছি না। একটা অজগর পাকে পাকে একটা লতাকে পিষে ফেলছে, কেবল এই উপমাটাই মনে হচ্ছে।

—আমার গল্পটা শোন্। প্রফুল্ল বললে, তুই না পারিস ভাবতে, না পা'স চোখে দেখতে। লোকটা যেমনই হোক, মেয়েটিও নেহাৎ ফুলকুমারী নয়। দেখিস নি ওর চশমাঢাকা চোখ দুটির ক্লান্তি, যেটা একান্তই বয়সের ; ওর কাঁপা গলা, যেটা নৈরাশ্যের।

কবিত্ব রেখে প্রফুল্লকে ওর মনে মনে তৈরি গল্পটা বলতে বললুম।

—আমার তো মনে হয়, প্রফুল্ল বললে, ওরা এককালে ছিল সহপাঠী। কিম্বা পাশাপাশি বাসার বাসিন্দা। হৃদয়-বিনিময় দু'জনের অগোচরে কখন ঘটে গেছে, কেউ টের পায়নি। যখন টের পেল, তখন দেখল, মেয়েটির মাথার ওপর অবিবাহিত আরো দু'বোন, ছেলেটির ওপর বৃহৎ সংসারের ভার। ইতিমধ্যে বিপুল ধার রেখে বাবা মারা গেছেন, বৌদি আর কয়েকটি বাচ্চাকাচ্চা রেখে দাদা নিরুদ্দেশ। ছেলেটি পড়াশুনায় ইস্তফা দিল। আর মেয়েটি ঘরের কোণে বসে ছেঁড়া জামা-কাপড় শেলাই করে শালীনতার সঙ্গে রফা করার চেষ্টা করতে লাগল।

হয়তো দিনান্তে একবার দেখা হয়, বারান্দার রেলিং-এর ধারে, সিঁড়ির নিরিবিলি কোণে, লোকের চোখ-পালানো ছাতের আলিসার ধারে।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, কিছু হ'ল ?

হয়নি, ছেলেটি বলে, হবে।

—কবে ?

ছেলেটি উত্তর দেয় না।

আরো কিছু কাল কাটে। কোনক্রমে মেয়েটির একটি দিদি কুমারিকা অন্তরীপ পার হ'ল (একটা শ্লেষ ব্যবহার করলুম, ক্ষমা কোরো) মেয়েটির মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল। রেস্তোরাঁয় বসে শুধোলে, তোমার চাকরি হ'ল?

—ভরসা পেয়েছি, ছেলেটি বলল। আরো কিছুকাল অপেক্ষা করো।

অপেক্ষা করতে আপত্তি কী। আশা থাকলেই হ'ল। একবছর বাদে মেজদিরও যখন বিয়ে হয়ে গেল, সেদিন মেয়েটির মুখে হাসি থৈ থৈ।

—অপেক্ষার দিন ফুরিয়ে এল, উজ্জ্বল চোখে বলল।

—হ্যাঁ, এল। হাসি দিয়ে ছেলেটি হাসির প্রত্যুত্তর দিল। একটা চাকরিও পেয়েছি।

কিন্তু ওদের হিসাবে ছেলেটির মার কঠিন অসুখের কথা লেখা ছিল না। মেয়েটির মা-ও যে দু'টি মেয়েকে পার করে দেবার স্বস্তিতে ফের আঁতুরে গিয়ে ঢুকবেন, তা-ই বা কে জানতো।

—আরো কিছুদিন অপেক্ষা করো।

কিছুদিন? কিছুদিনের সমষ্টিতেই তো কিছু সপ্তাহ, কিছু মাস, কিছু বছর? একজনের বয়স এদিকে পঁচিশ ছুঁয়েছে, আরেকজনের তিরিশ। আরো অপেক্ষা?

—অগত্যা। ভয় হচ্ছে রিট্রেঞ্চড্ হয়ে যাবো।

ভয়ে, অপেক্ষায় আরো দু'বছর। সাতাশ আর বত্রিশ। আরো? প্রথম কুঁড়ি ঝরে গেছে কবে, নটে গাছটি শুদ্ধ যে মুড়িয়ে এলো। দিন যাচ্ছে, সংসারের সমস্যাও বাড়ছে। দু'জনে মিলে স্বার্থপর স্বপ্ন দেখার সময় কই। তবু দু'জনের আজো দেখা হয়। লোক লুকিয়ে, গলির অপ্রকাশ্য কোণে একে অপরের প্রতীক্ষা করে। কী-ই বা

বাকি আছে আর, সবই তো ফুরিয়ে এসেছে। শুধু ফুরোয়নি ভরসা। ক্লান্তির ভারে কুঁজো, তবু দিনের পর দিন দেখা হয়। সকলের অগোচরে দু'জনে মেলে, চিরকালের প্রতীক্ষা আর চিরকালের আশ্বাস।

—এই আমার গল্প। প্রফুল্ল থামল।

চোখ বুঁজে আমিও অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম। কে জানে হয়ত এই। একবার দেখেই মানুষ চেনা যায় না-তো। হয়ত ক্লান্ত প্রতীক্ষার যুগলরূপ দেখেছি আজ সন্ধ্যায়। কালো-কর্কশ প্রায়গত-যৌবন লোকটির মধ্যেই হয়ত প্রচ্ছন্ন আছে অনেক অনেক বছর আগেকার এক বলিষ্ঠ প্রাণ। যে স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখিয়েছে আরেক জনকে। পাশিং-শো-টানা কালো-হয়ে-আসা ঠোঁট দুটিই যে একদিন আশায় স্ফুরিত হয়ে উঠত না, কে বলবে।

এর পরে আরো কয়েকদিন ওদের দেখলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি মূর্তি এসে দাঁড়ায় গ্যাসপোস্ট ঘেঁসে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আরেকটি ছায়া এসে পড়ে দেয়ালে, 'মিশর কুমারীর' প্রাচীরপত্রে। কী কথা হয় কিছুক্ষণ দু'জনে, ছেলেটি একদিকে চলে যায়। মেয়েটি আরেক দিকে। কোন কোন দিন মেয়েটিকে দেখি মেয়েদের হস্টেলের দিকে যেতে।

উনি কি হস্টেলে থাকেন, কলেজে পড়েন? মনে তো হয় না। ঠিক এ বয়সের কোন মেয়ে কলেজে সচরাচর পড়ে না। তবে কি প্রফুল্লর গল্পই ঠিক। কে জানে! কিছুই প্রায় বুঝিনি। স্তিমিত-যৌবন দু'টি নরনারীর দৈনন্দিন সশঙ্ক সান্ধ্য সম্মিলনের শুধু একটা বেদনামলিন ছবি মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

ক্লাসের তাড়া, হাসপাতালে ডিউটি, সামনে পরীক্ষা, আমার কৌতূহল মেটাতে মনগড়া একটা কাহিনী যথেষ্ট।

কিন্তু প্রফুল্লর কথা স্বতন্ত্র। উদ্যোগী পুরুষসিংহ, ও ইতিমধ্যেই মেয়েটির পরিচয় সংগ্রহ করে এনেছে। পরিচয় মানে নাম এবং ধাম। নাম, প্রফুল্ল বললে, কৃষ্ণকুন্তলা। ধাম আপাততঃ লেডীস্ হস্টেল।

—ছাত্রী ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—না। আবার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও নয়। ওই হস্টেলের সুপার বুড়ো হয়েছেন, তাই দেখাশোনা করবার জন্যে সম্প্রতি একে নিয়োগ করা হয়েছে।

—আর ?

—আর জানিনে। মেয়েদের ছোটখাটো সুবিধে অসুবিধের দেখাশোনা করা, এই ওর কাজ। মাঝে মাঝে দু' একটি মেয়েকে নিয়ে সন্ধ্যার পর হাওয়া খেতেও ওকে বেরোতে দেখেছি।

—আর ওর সঙ্গীটি ?

—ওর সম্বন্ধে, প্রফুল্ল বললে, বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। খালি সন্ধ্যার অন্ধকারেই আনাগোনা করবে,—দিনের আলোয় ওকে দেখা গেলে তো। আর সত্যি কথা বলতে কি ভাই, ওকে আমি কিছুতেই কৃষ্ণকুন্তলার প্রেমাস্পদ হিসেবে ভাবতে পারিনে। কী রকম চোয়াড়ে চেহারা দেখেছিস তো। ওর মতো একটা লোফারকে কুন্তলার মতো রিফাইন্‌ড টেস্টের মেয়ে কি করে ভালোবাসলে ভেবে পাইনে। আমি তো ভাবছি, আমার গল্পটাতে লোকটাকে সুপুরুষ করে নেবো। আচণ্ডালে চৈতন্যদেব ধ'রে কোল দিয়েছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদের কাছ থেকে আমরা একটু বাছবিচার প্রত্যাশা করি।

এর পরে কৃষ্ণকুন্তলাকে আমাদের বাসাতেই একদিন দেখলাম। বাইরের ঘরে বসে মার সঙ্গে গল্প করছিলো, খুব কাছ থেকে দেখে মনে

হ'ল, বয়স অন্তত ত্রিশ। দু'হাতে দু'গাছি মাত্র চুড়ি, সিঁথেয় সিঁদুর নেই। প্রফুল্ল তবে ঠিকই বলেছে, কৃষ্ণকুন্তলার বিয়ে হয় নি এখনও।

মা কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন, ভারি চমৎকার মেয়ে। ওই হস্টেলে চাকরি নিয়ে এসেছে। খুব হাসিখুশি। রেবা-বাণীদের গান শেখাবে কথা দিয়েছে। আমাকে খান দুই কীর্তন শুনিয়ে গেল। খাসা গলা।

এরপরে প্রায়ই আমাদের বাসায় কৃষ্ণকুন্তলাকে দেখা যেতে লাগল। প্রায়ই কলেজ থেকে ফেরবার সময় দেখি, সেই লোকটা বাসার সামনে পায়চারি করছে। কৃষ্ণকুন্তলার জন্যে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়। কোন কোন দিন সিঁড়ির মুখেই কৃষ্ণকুন্তলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, দেখি দ্রুত পায়ে নেবে আসছে।

ওপরে উঠে হয়ত দেখি, প্রফুল্ল তক্তপোষে চিৎ হয়ে সিগারেট টানছে। বললাম, কী-রে, এত শীগ্গির কলেজ ছুটি?

প্রফুল্ল বললে, হুঁ।

বললাম, কৃষ্ণকুন্তলা এসেছিল যে। তোর গল্পের হিরোইন।

সিগ্রেটটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে প্রফুল্ল বললে, হুঁ দেখেছি। এ ঘরেও তো এসেছিল।

—আর তোর হিরো রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে।

অন্যমনস্ক একটা হাই তুলে প্রফুল্ল বললে, শেষ পর্যন্ত কে হিরো হয়, কে জানে। নাট্যকার স্বয়ং হয়তো নাম-ভূমিকায় নামতে পারেন।

চমকে বললাম, অর্থাৎ?

প্রফুল্ল আর কিছু ভাংলো না।

কিছুদিন ধরে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, প্রফুল্লর ভাবান্তর ঘটেছে। ঠিকমত সময়ে কলেজে যায় না, উচিতমতো আহারাদি করে না। কৃষ্ণকুন্তলার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাও লক্ষ্য করলাম। আমাদের বাসায়

প্রায়ই আসে কৃষ্ণকুন্তলা, আর, যখন আসে, তখন প্রফুল্লর সঙ্গে দু'দণ্ড গল্পগুজব না করে যায় না।

মা অবশ্য কিছু মনে করতেন না, কেন না, প্রফুল্ল ও কৃষ্ণকুন্তলা, দু'জনকেই তিনি বিশেষ বিশ্বাস করতেন। আমি বরাবরই একটু লাজুক প্রকৃতির, মেয়েদের সঙ্গে মাথা তুলে কথাই বলতে পারিনে। বাড়িশুদ্ধ লোক যখন কৃষ্ণকুন্তলা বলতে পাগল, কেউ গানে, কেউ কথায়,—আমি তখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। কৃষ্ণকুন্তলার সঙ্গে আমার ভালো করে আলাপ পর্যন্ত হয়নি। মেয়েদের দেখে এক ধরনের মেয়েলি লজ্জা আর কি।

নীরদ বলল, আপনার গল্প বুঝেছি ডাক্তারবাবু। মানুষকে পাত্রপাত্রী করে সেই খরগোস আর কচ্ছপের কাহিনীটাই বলতে চান তো? শেষ পর্যন্ত আপনিই বোধ হয় প্রফুল্লকে পাশ কাটিয়ে কনুইয়ের জোরে এগিয়ে গেলেন?

ডাক্তার চৌধুরী এ মন্তব্যের কোন জবাব দিলেন না। একটি চুরুট ধরিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে টেনে ফের শুরু করলেন।—

—আমি ভাবি, প্রফুল্ল কৃষ্ণকুন্তলার মধ্যে পেল কী। বিষমবয়স, আর ওই তো রূপ!

প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওর সঙ্গে কী এত আলাপ করিস বল তো।

—বাঃ রে, ওকে নিয়ে গল্প লিখবো আর ওর কাহিনীটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেবোনা?

—জান্‌লি কিছু?

কৃত্রিম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল বললে, বড়ো চাপা মেয়েরে, এমনিতে এত কথা বলবে, অথচ নিজের কথা উঠলেই আলগোছে এড়িয়ে যাবে।

—সেই লোকটা এখনো ঘোরাফেরা করে, জানিস? সন্ধ্যার অন্ধকারে এখনো ওদের দেখা হয়।

—জানি।

দম নিয়ে আমি এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম, তবে তুই মরছিস কেন। এক আকাশে চন্দ্র-সূর্য, এই দু'টোর কি—

বাধা দিয়ে প্রফুল্ল বলে উঠল, দোহাই তোর, ওই থিয়েটারী তুলনা ছাড়া আর একটা কিছু বল। আর, জেনে রাখ, এক আকাশেই চন্দ্র-সূর্যের স্থান হয়,—তবে সময় আলাদা, এই-যা।

বুঝলাম, প্রফুল্লকে বোঝানো বৃথা। পড়াশুনা করতে কলকাতা এসেছিল। ভালো ছেলে, রেজাল্ট-ও মন্দ করত না। কিন্তু এখন যা সর্বনাশা নেশা জুটলো—

নীরদ করজোড়ে বলল, দোহাই ডাক্তারবাবু, একটু সংক্ষেপে সারুন। গল্পটি এমনিতেই দেখছি রীতিমতো বড়ো, আপনার টীকার ভার আর চালাবেন না। এখনো দু'চার হাত তাস খেলার আশা রাখি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার চৌধুরী বললেন, বেশ। রসের চেয়ে ছানার দিকেই যখন আপনাদের নজর বেশি, শুনুন তবে।

একদিন সকালে, তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি। প্রফুল্ল ঘরে এলো। চোখ মুখ অস্বাভাবিক কালো, প্রফুল্লর দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝলুম, একটা কিছু ঘটেছে। তখনো নাড়ীটেপা ডাক্তার হইনি, এমনিতেই আন্দাজ হল ওর হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু দ্রুততর।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে?

প্রফুল্ল জবাব দিল না, একটা খবরের কাগজে মুখ আড়াল করল।

বললাম, পত্রিকা-আপিস থেকে সেই গল্পটা ফেরৎ এসেছে বুঝি?

তিক্ত একটা অব্যয় উচ্চারণ করে প্রফুল্ল বলল, দুত্তোর ছাই গল্প। ফেরৎ আসেনি, তবে আনতে হবে। ভুল, একেবারে, সব ভুল?

—কী ভুল রে, যে একেবারে মোহমুদ্গর নিয়ে পড়লি ?

—ভুল আমার গল্প, আমার থিয়োরী। কৃষ্ণকুন্তলা,—সব ভুল। এই দেখ।

খবরের কাগজের দু'কলমব্যাপী শিরোনামায়, সেদিনই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছিল। কলকাতার কোন একটি ছাত্রী-নিবাস-ঘটিত স্ক্যাণ্ডালের সবিস্তার বর্ণনা। আসল নাম গোপন করে বলছি, নইলে আপনারাও বুঝতে পারতেন। এইটুকু বোঝা গেল যে কৃষ্ণ-কুন্তলা আর জলধর—যাকে আমরা চিরন্তন প্রতীক্ষার প্রতীক মনে করেছিলাম,—এরা দু'জনে ছিল আড়কাঠি। কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে ওরা এই অবৈধ ব্যবসা খুলেছিল। অনেক বড়োঘরের নামজাদা মক্কেল ছিল ওদের। কত মেয়েকে যে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে তার হিসেব নেই। কৃষ্ণকুন্তলা ফেরার, আর জলধর গ্রেপ্তার হয়েছে। মামলা চলবে এবার।

প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে বললাম, অনেক রুই-কাৎলার নাম এবারে বেরিয়ে পড়বে,—সেই সঙ্গে কতো ঘর যে ওরা ভেঙেছে তার কাহিনী।

প্রফুল্ল কোন জবাব দিলেনা।

একটু খোঁচা দিয়ে বললাম, দুখ্খু করিসনি। অবজারভেশন সব সময় ঠিক হয়না-তো। আর কল্পনা দিয়েও সব কিছুর থই পাওয়া যায় না।

প্রফুল্ল আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

সেদিন শহরময়, রেস্তোরাঁয়, কলেজে, এমন কি আমাদের বাসায় যে উত্তেজনা দেখেছিলাম তার তুলনা নেই। সবারই মুখে মুখে কৃষ্ণকুন্তলার নামের উচ্চারণ। আর ভ্রূকুঞ্চন।

মা বললেন, হাসিমুখে আসত, গান গাইত, ওর মধ্যে যে এমন বিষ

আছে, কখনো ভাবতেও পারিনি। কী মৎলবে এ বাসায় ভ্রমি ঢুকেছিল, কে জানে।

রেবা-বাণী বলে উঠল, জানো মা, কুন্তলাদি মাঝে আমাদের নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইতো। বলতো।—

—কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! মা আঁৎকে উঠলেন, যাস নি তো? মা কালী তোদের রক্ষা করেছেন। মা দু'হাত কপালে ছোঁয়ালেন।

আর প্রফুল্ল? নীরদ জিজ্ঞাসা করল।

প্রফুল্লর দিকে ক'দিন ধরে তাকানোই যেতো না। চোখমুখ সব বসে গেছে। চুলগুলো সব এলোমেলো, তাকালেই বোঝা যেতো কী কঠিন আঘাতই না প্রফুল্ল খেয়েছে। প্রথম ক'দিন উন্মনা, অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরলো। সময়মত আসে না, খায় না। বই পড়া, লেখা ইত্যাদি প্রফুল্ল ছেড়েই দিল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম। জানতুম একদিন ও সামলে নেবেই। হ'লও তাই। তারপর আবার, কিছুদিন যেতে দেখলুম প্রফুল্ল পাঠ্যপুস্তকের ধূলো ঝাড়ছে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

কৃষ্ণকুন্তলা-ঘটিত কাহিনীর এইখানেই উপসংহার ঘটতো, ডাঃ চৌধুরী বললেন, কিন্তু এর পরেও একটুখানি পরিশিষ্ট আছে।

প্রায় দিন পনেরো পরে, একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলুম একটি লোক আমাদের বাসার সমুখে দাঁড়িয়ে কাগজে-লেখা একটা ঠিকানার সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে দেখছে। এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, কাকে চাই?

সে প্রফুল্লর নাম করলে।

বললুম, দাঁড়ান, দেখছি, আছে কিনা।

প্রফুল্ল বাসায় ছিল, আমি লোকটাকে বসবার ঘরে নিয়ে এলুম।

লোকটি, প্রায় আমাদেরই বয়সী হবে, দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বলল।

—কী দরকার বলুন তো, প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল।

—আমি কৃষ্ণকুন্তলা দেবীর কাছ থেকে আসছি, লোকটি প্রফুল্লর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল,—কৃষ্ণকুন্তলা আজ সকালে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

পলকে রঙ বদলে গেল প্রফুল্লর মুখের, লক্ষ্য করলুম। তবু নিরাসক্তির ভাণ করে সে বললে, ও।

লোকটি বললে, তিনি আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন।

দীর্ঘ চিঠি। এতদিন পরে সবটা আমার মনে নেই। যতটা আছে, তারই খানিকটা আপনাদের বলছি। চিঠিটা কতকটা এই ধরনের ছিল :—

প্রফুল্ল,

তোমাকে চিঠিই লিখতে হ'ল, কেন না তোমার সঙ্গে দেখা করবার আর পথ নেই। মুখও বোধহয় নেই, না? এতদিনে নিশ্চয় আমার কীর্তিকাহিনী সব জেনে গেছ। খবরের কাগজগুলো তো ছিক্কার আর ধিক্কারে ভরে গেছে। আমার নামোচ্চারণে সিঁটকে ওঠে না, এমন নাক বাংলাদেশে সম্ভবত নেই। আমার পরিচয় সবাই জেনেছে, সবার সঙ্গে তুমিও। একটা ঘৃণ্য ব্যবসায়ের আড়কাঠি আমি।

কিন্তু একথা কি তোমাকে কখনো বিশ্বাস করাতে পারবো প্রফুল্ল, যে আমার আরো একটা পরিচয় আছে। জানি, পারবো না। তবু এ-চিঠি না লিখেও পারলুম না। এটা হয়ত আমার দুর্বলতা।

কিন্তু দুর্বলতা তো আমি তোমার মধ্যেও দেখেছি প্রফুল্ল। আমাকে ভালো করে চিনতে না, আমার সঙ্গে তোমার কোন কিছুর মিল ছিল না, না রুচির, না বয়সের, তবু তোমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে তোমার চোখের কথাও পড়েছি। পড়ে মনে মনে

দুঃখই পেয়েছি। জানতাম, একদিন আমার পাপবৃত্তির কথা তুমি জানবে। সেদিন তোমার মুগ্ধ চোখ দুটিতে যে ঘৃণা ফুটে উঠবে, তা কল্পনা করেও শিউরে উঠেছি।

নিজের জন্তে ভাবি না। পরিণামের কথা ভেবে এ কাজে হাত দিইনি, কিন্তু পরিণামের সম্ভাবনা দেখে পিছিয়েও যাইনি। গ্রামের বিধবা মেয়ে। সব খোয়ালুম, শুধু আশাটুকু নয়। পোড়া ঘর নতুন করে গড়ার প্রতিশ্রুতি যে দিয়েছিল, কলকাতায় এসে সেই ঘরামির পরিচয় জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। তা ছাড়া, তখনও ঘরবাঁধার স্বপ্ন আমার যায়নি। জলধর বললে, কাজটা খারাপ বটে, কিন্তু লাভ ঢের। কিছুদিন যদি চালিয়ে যেতে পারি,—কুন্তলা তুমিই আমার সহায় হবে,—তবে বেশ কিছু গুছিয়ে নিতে পারবো। তারপর দু'জনে মিলে কোথাও গিয়ে—

প্রথম প্রথম দ্বিধা ছিল। সহজেই মেয়েদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারতাম, সেই ছিল আমার আর জলধরের ব্যবসার পুঁজি। এক একটি মেয়েকে কমিশনের বিনিময়ে পিছল পথে ঠেলে দিয়েছি, আর দেহমন গ্লানিতে ভরে গেছে। জলধরকে কতদিন বলেছি, পারবো না, আর পারবো না।

জলধর চাপা গলায় বলেছে, আর কিছুদিন, লক্ষ্মীটি। আরো কিছু টাকা। তার পরেই—।

বিশ্বাস করেছি। শেষে একদিন আবিষ্কার করলাম, এই কিছুদিন আর ফুরোবে না। একদিন জলধরের বাসায় বসে আছি। এমন সময় একটি মেয়ে এলো। তাকে দেখে জলধর বিবর্ণ হয়ে গেল, সেটা লক্ষ্য করতে ভুল হ'ল না। আড়ালে চলে গেল জলধর, চাপা অথচ ক্রুদ্ধ গলায় কী কথা হ'তে লাগল মেয়েটির সঙ্গে।

মনে হ'ল মেয়েটি টাকা চায়। দু'একটা অস্পষ্ট কথা কানেও এলো, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলুম না। জলধর ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করলুম, ও কে জলধর, কী চায়।

জলধর কেমন একটু থতমত খেয়ে বললে, আমাদের দেশের মেয়ে।

অমন যে তুখোড় লোক, তাকেও তোৎলামি করতে দেখলুম। ধমক দিয়ে বললুম, মিছে কথা বলার চেষ্টা মিছিমিছি করছ জলধর, আমি সব শুনেছি!

পলকে কেমন হিংস্র হয়ে গেল জলধর। বললে, শুনেছ যখন, তখন তো চুকেই গেছে। হ্যাঁ, জেনে রাখো ও আমার স্ত্রী।

—তোমার স্ত্রী। যখন তেজ দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলুম, তখন কি জানতুম, সব জেনে আমার হাত-পা হিম হয়ে যাবে, পায়ের নীচে মাটি থাকবে না দাঁড়াবার?

ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, স্ত্রী আছে, আমাকে এতদিন জানাওনি কেন জলধর? কেন ভুলিয়েছ আমাকে?

জলধর বললে, আমি ভোলাইনি, ভুলেছ তুমিই। আমি বড়োজোর একটুখানি লুকিয়েছি। কিন্তু সে-ও তোমার ভালোর জন্যেই।

আমার ভালো। তীব্রতম দুঃখ আর তিক্ততম হাসির উৎস যে একই, আবিষ্কার করলুম সেদিন। বিশ্বশুদ্ধ লোকের এমন কিছু ভালো করিনি, যাতে আমার ভালো হবে জলধর।

ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম। আমার অতীত ছিল না, বর্তমান শুধুই ক্লেদ, এক ভবিষ্যতের আশা। তা-ও গেল। জলধরের জীবিকাসঙ্গিনীই থাকতে হবে বরাবর, জীবনসঙ্গিনী কোনদিন হতে পারবো না। সারা জীবন শুধু কদর্য বৃত্তির কদন্নে ভুরিভোজন।

এমন আত্মগ্লানি দস্যু রত্নাকরেরও আসেনি।

এরই মধ্যে একদিন স্থরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, যার হাত দিয়ে এই চিঠি তোমাকে পাঠাচ্ছি। আমাদের দেশের ছেলে, বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। অনেকদিন দেশছাড়া। কলকাতায় কায়ক্লেশে একটা মেসে থাকে। সামান্য কিছু পায়, তাতে কোনমতে পেট ভরে, শরীর ঢাকে। এরি মধ্যে ছেলেটি স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গতি নেই, বিয়ে করে। অথচ কথায় কথায় একদিন জানলুম, স্থরেন একটি মেয়েকে ভালোবাসে।

একদিন স্থরেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বিয়ে করছ না কেন?

বললে, টাকা কোথায়?

ভাবলাম এই তো মুক্তির পথ পেয়েছি।

সেইদিনই ঠিক করলাম, আমি ওদের বিয়ে দেবো। টাকা ইতিমধ্যেই হাতে কিছু জমেছিল, তা আমার কোন কাজেই লাগবে না। আমার তো কোনদিনই ঘর হবে না, এরা ছু'জন চিরকাল পথে পথে ঘুরে মরে কেন? স্থরেনকে যেদিন বলি ওকে আমি টাকা দেবো, সেদিন প্রথমে ও আপত্তি করেছিল। তারপর অনেক পেড়াপীড়িতে রাজিও হ'ল। ওদের বিয়ে দিলাম, আস্তানাও ঠিক করে দিলাম একটা; শহরের বাইরে ছোট্ট একটু বাসা;— আমারি তৈরি ঘর, কিন্তু আমার নয়। বিনিময়ে মৌন চার চোখের যে কৃতজ্ঞতা পেলাম, মনে হ'ল তাতেই আমার সব পাপ ধুয়ে গেছে। স্থরেন অবশ্য আমার বৃত্তি কী, জানতো না। আমি কয়েকটা সমিতি, ইন্‌স্টিটিউসন ইত্যাদির সেক্রেটারি, এই ধরনের ভাসা-ভাসা একটা ধারণা ছিল ওর। পরে ও অবশ্য সব জেনেছে, তোমার এবং আর পাঁচজনের সঙ্গে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ও আমাকে ঘৃণা করল না। আইনের হাত এড়িয়ে যখন পালিয়ে পালিয়ে ফিরছি, তখনও আমাকে ওর বাসায় আশ্রয় দিয়েছে। এ আশ্রয় টি'কবে

না, জানি, একদিন ধরা পড়বই, কিম্বা হয়ত নিজেই ধরা দেবো, মনকে আমার বিশ্বাস নেই। তার আগে সব কথা তোমাকে লিখে রাখলুম। ঈশ্বর জানেন কেন। আগেই বলেছি, হয়ত আমার দুর্বলতা। বিশ্বাস করবে এ ভরসা রাখি না, কিন্তু গল্প লিখতে পারবে। গল্প তো অবিশ্বাস্য বিষয় নিয়েও হয়। ইতি।

.

চিঠি শেষ করে সুরেনের দিকে তাকালাম।

সুরেন বলল, এ ক'দিন উনি আমার ওখানেই ছিলেন। বলেছিলেন, ধরা যদি পড়ি চিঠিটা এই ঠিকানায় পৌঁছে দিও। তিনদিন আগে উনি আমার বাসা থেকে চলে যান। ধরা পড়েছেন আজ।

সুরেনের ধরা-গলায় আর কৃতজ্ঞ, দীপ্ত চোখের আলোয় কৃষ্ণকুন্তলার আরো একটা পরিচয় পড়লাম। সারাজীবন কৃষ্ণকুন্তলা শুধু ঘর ভাঙেইনি, অন্তত আরেকটা ঘর তো গড়েছে। হয়ত ঘর-গড়ার জন্যেই ঘর ভেঙেছে।

ডাঃ চৌধুরী চুপ করলেন।

নীরদ বললে, শেষ হ'ল আপনার গল্প ?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ।

—কী প্রমাণ হ'ল এতে।

ডাক্তার একটু হাসলেন,—অরসিকের মতো প্রশ্ন করবেন না। গল্প জ্যামিতি বা ন্যায়শাস্ত্র নয় যে কিছু প্রমাণ করবে। গল্প শুধু বলে।

নীরদ তবু বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ডাক্তারবাবু,—আপনি নিজেই প্রফুল্ল নন তো। ও চরিত্রটা কি বানানো।

ডাক্তারবাবু আবার হাসলেন, গোটা গল্পটাই যেখানে বানানো হবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে একটি বিশেষ চরিত্র বানানো কিনা একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। এ প্রশ্ন-ও বাতিল।

নীরদ আরো কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, ডাক্তারবাবু দ্রুত তাস বেঁটে নিজের হাতটা তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করলেন।—আর কোন কথা নয়। এবারে দু'হাত খেলি আসুন। আড়াই ট্রিকের কমে কল দিয়ে মুশকিলে ফেলবেন না কিন্তু।

শরিক

এক

সারা রাত ডিউটি ছিল। ভোরের দিকে সুধাময় অফিসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে উঠতে বেলা হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে যথারীতি পাঞ্জাবিটা খুলে ব্রাকেটে টাঙিয়ে রাখতে যাবে, হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখল, একটি মেয়ে আনত হয়ে ওকে প্রণাম করছে। প্রণাম গ্রহণে বরাবরই সঙ্কোচ ছিল, পা দু'টো সরিয়ে নিতে যাবে, ততক্ষণে মেয়েটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

—কী মশাই, চিনতে পারছেন?

সুধাময় দেখল হাসিভরা একখানা মুখ, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। সদ্য স্নান করে এসেছে, চোখের পল্লবে এখনো আর্দ্রতা, বিপর্যস্ত কবরীতে জলকণা। বোঝা যায়, প্রসাধন এখনও অসম্পূর্ণ।

—চিনতে পারলেন না তো!

চিনতে সুধাময় পারেনি সত্যি। ঘরের এককোণে উমা ছোট খুকিকে দুধ দিচ্ছিল. সে বললে, আমার খুড়তুতো বোন নীলিমা। তোমার মনে নেই! সেই বিয়ের সময় একবার মাত্র দেখেছিলে। ওরা ঢাকায় থাকতো, দেশের বাড়িতে থাকতো না তো।

এতক্ষণে সুধাময় একটু সহজ হতে চেষ্টা করল।—ওহো, তাই বলো, তুমি নীলিমা। তখন কতো ছোট্টটি ছিলে, ফ্রক পরতে। এখন একেবারে সঞ্চারিণী পল্লবিণী হয়ে এসেছ, ঠিক চিনতে পারি নি।

নীলিমাও তক্তপোষ ঘেঁষে বসেছে। দুষ্টুমিভরা চোখে হাসতে হাসতে বলল, কী অসাধারণ মিথ্যে বলার ক্ষমতা আপনার, জামাইবাবু। আপনার কিছু মনে নেই, তবু বলছেন···তখন আমি ফ্রক পরতাম? কক্‌খনো না। দিদির বিয়ে হয়েছে তো মোটে ছ' বছর। আমি শাড়ি পরছি অন্ততঃ আট বছর ধরে। সুধাময় সামান্য অপ্রতিভ হ'ল বটে, কিন্তু তাতে আলোচনা চলতে কোন বাধা হ'লো না। নীলিমা কলকাতা এসেছে এখানে থাকবে বলে। এম, এ পাশ করেছে ঢাকা থেকে। কলকাতায় একটা মেয়েদের স্কুলে মাস্টারি জুটেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষই লিখেছিলেন বোর্ডিংয়ে থাকবার জায়গা নেই। একেবারে ভর্তি। আপাতত নীলিমা যদি কোথাও অন্ততঃ অস্থায়ীভাবেও থাকবার সুযোগ করে নিতে পারে, পরে তাঁরা বোর্ডিংয়ে কোনো একটা সীট খালি হলেই নীলিমাকে নিয়ে নেবেন।

নীলিমা বলল, অতএব আপাতত কিছুদিন আপনার এখানেই। তাড়িয়ে দেবেন না তো।

সুধাময় একটু মুখচোরা। চট করে কোন কথার জুৎসই জবাব মুখে জোগায় না। ঢোক গিলে একটু রসিকতা করতে চেষ্টা করে বলল, একটি বোনের ভার যখন সয়েছি, তখন আরেকটিরও সইতে পারব।

কী পৌরুষ! সকোপে বলল নীলিমা, আর উমা বোকা-বোকা চোখে ওদের দিকে চেয়ে কনিষ্ঠতমকে যথারীতি স্তন্যদান করে যেতে লাগল।

সেদিনকার বাজার কিছু বেহিসেবিই হ'ল। দৈনিক বরাদ্দ দেড় টাকা উঠলো ন' সিকেয়, সবে-ওঠা পটল থেকে ফুরিয়ে-আসা ফুলকপি পর্যন্ত অনেক কিছু কিনে ফেলল সুধাময়।

উমা মনে মনে বিরক্ত হ'ল। সারারাত মেজো মেয়েটা বিকারের ঘোরে কাটিয়েছে, ঘুমুতে দেয়নি। এখন এই রান্নার ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে না।

সুধাময়কে জিজ্ঞাসা করল, আজ ডাক্তারের কাছে যাবে না? বেলার জ্বরটা কমছে না কিছুতেই।

সুধাময় নাইতে যাচ্ছিল, বলল, ইচ্ছে করছে না।

সারা দুপুর সুধাময় পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছিল, ঘুম ভাঙতেই দেখল, নীলিমা একপেয়ালা চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে খানিকটা তাপহীন রোদ্দুর ঘরে এসে পড়েছিল। নিজের ঘুমভাঙা চোখে নীলিমার সদ্য ঘুমভাঙা মুখখানা ভালোই লাগল।

চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে সুধাময় বলল, তোমার হাতের চা খেতে সাহস হচ্ছে না ঠিক। কে জানে নুন-টুন দিয়েছ কিনা।

সুদৃশ্য কেসের মধ্যে সারি সারি সিগারেটের মতো ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে নীলিমা বলল, আমরা সেকেলে শালি নই মশাই। ওসব পুরানো রসিকতা জানা নেই। বরং আপনার গিন্নীর চেয়ে কিছু বেশিই চিনি দেবো ; জানলেন!

কপট আতঙ্কে সুধাময় বলল, ওরে বাবা, সেটাও কম রিস্‌কি নয়। তোমার দিদি যতটা দেন, তার চেয়ে তুমি বেশি দিলে তোমার দিদি কি পছন্দ করবেন?

উমা মেজার গ্লাসে ওষুধ ঢালছিল, ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

পরদিন দুপুরে, নীলিমা তখন ইস্কুলে গেছে। ডাকে এলো একখানা মাসিক পত্র। মোড়কটা উৎসুক হাতে খুললে সুধাময়। সারাদিন খাটুনির পর উমা শুয়েছিল। ওকে ঠেলে তুললে।

—এই, দেখ দেখ, সেই গল্পটা বেরিয়েছে আমার।

উমার একটু তন্দ্রা এসেছিল বুঝি। জড়িত গলায় জিজ্ঞাসা করল, কোন্‌টা।

—পড়েই দেখ না!

কাগজখানা হাতে নিয়ে উমা বারকতক নাড়াচাড়া করল; ওঃ এই গল্পটা। কী অদ্ভুত নাম দিয়েছ, 'সেদিন চৈত্রমাস।' টাকা তো আগেই পেয়ে গেছ, না?

সুধাময় বলল, হ্যাঁ। সেই যে ওমাসে তিরিশ টাকা দিলুম। উমার চোখের সমস্ত ঔৎসুক্য এক নিমেষে নিবে গেল। গল্পটির সমস্ত মূল্য যেন ঐ ত্রিশটাকা, সে টাকাটা এ সংসারে যখন আগেই এসেছে এবং খরচ হয়ে গেছে, তখন আর ওর মনে কোন জিজ্ঞাসা নেই।

সুধাময় অনেক আগ্রহ করে গল্পটি রচনা করেছিল; একটি দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে ওকে কম মেহনৎ করতে হয়নি। লোভ হচ্ছিল, উমাকে পড়ে শোনায় গল্পটা।

—'সেদিন চৈত্রমাস' নামটা, বুঝলে, গলাটা ঈষৎ পরিষ্কার করে সুধাময় বলতে শুরু করল,—রবীন্দ্রনাথ থেকে নেওয়া। পড়োনি, প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস। তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।

—'আমার সর্বনাশ' নামও তো দিতে পারতে গল্পটার। উমা বলল।

—পারতাম। সুধাময় বলল, কিন্তু তাতে ধ্বনিমাধুর্য থাকতো না। তা ছাড়া সবটাই যেন বলা হয়ে যেন। সেটা ভারি 'চীপ'। গল্পটা শুনবে একটু?

উমার চোখ দু'টি আবার জড়িয়ে এসেছিল ঘুমে, বলল, পড়ো।

কিন্তু ইতিমধ্যে পাশের ঘরে খুকি বিকট গলায় কেঁদে উঠল, ধড়মড় করে উঠে বসে উমা তাকে দুধ খাওয়াতে বসল। আস্তে আস্তে পত্রিকাটা মুড়ে উঠে দাঁড়ালো সুধাময়।

—পড়লে না? উমা জিজ্ঞাসা করল।

—থাক, সুধাময় বলল, তুমি ওকে দুধ দাও।

—কোথায় বেরুচ্ছ আবার এখন?

—একটু ঘুরে আসি।

—খালি ঘোরা আর ঘোরা। ঘরে বসে এসে একটু গল্পো-টল্পো লিখলেও তো পারো বাপু। তবু দু'টো টাকা আসে।

—টাকা? সুধাময় একটুখানি হাসল,—তা আসে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, ধর্মতলায় পকেট মারলে, সম্ভবত, আরো বেশি আসে।

ইস্কুল থেকে ফিরে এসে নীলিমা দেখল, পত্রিকাখানা বিছানার ওপর উপুড় করা। তৎক্ষণাৎ সে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। 'সেদিন চৈত্রমাস।' জামাইবাবুর নাম দেখছি যে দিদি! জামাইবাবু লেখেন বুঝি?

—লেখে তো। উমা বললে, তবু ওতে যা হোক দশ-পাঁচ টাকা হয়। নইলে খরচই কুলোতো না।

ততক্ষণ নীলিমা গল্পটার মধ্যে ডুবে গেছে। এক নিঃশ্বাসে গল্পটা শেষ করে বইটা মুড়ে রেখে বলল, ভারি সুন্দর লেখা তো। কি অদ্ভুত চরিত্র মেয়েটার। পড়েছিস গল্পটা দিদি?

উমা বললে, না। পরে পড়বো। তারপর হেসে বললে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারি না ভাই তোর জামাইবাবুর গল্প। কেমন ধারা যেন, ভাষাটাও কেমন খাপছাড়া-খাপছাড়া, গল্পের শেষগুলোও তেমনি।

সোৎসাহে উমা নীলিমাকে ছোটগল্পের লক্ষণ বোঝাতে বসল। ছোটগল্প, ছোটও হবে গল্পও হবে। আবার বিশেষ ছোট নাও হতে পারে, এমন কি গল্পও না হতে পারে। একটা মুড্, একটা মুহূর্ত, একটা উপলব্ধি, এ নিয়েও ছোটগল্প হয়।

খবরের কাগজ দিয়ে এলুমিনিয়মের বাটিতে দুধ গরম করতে করতে উমা একদৃষ্টে নীলিমার দিকে চেয়ে ছিল।

সেই দৃষ্টিতে নীলিমা ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, ওর বক্তৃতায় ছেদ পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কী দেখছিস।

ঝিনুক দিয়ে দুধটা নাড়তে নাড়তে উমা বলল, তুই ঠিক শালে।
জামাইবাবুর মতো কথা বলিস।

গা ধুয়ে এসে নীলিমা মুখে ক্রীম ঘষছিল, এমন সময় সুধাময় এসে পড়ল। পাঞ্জাবি খুলে রাখতে যাবে, নীলিমা বলল, কী মশাই, এদিকে দেখলে তো মনে হয়, সাদাসিধে নিরীহ ভালো মানুষটী। গল্প লিখতে বসলে অতো ছুঁচলো কথা কলমে আসে কী করে।

সুধাময়ের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল : তুমি পড়েছ?

চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে নীলিমা মাথা দুলিয়ে বলল, পড়েছি। দম বন্ধ করে পড়েছি।

—কেমন লাগল।

ঘাড়ে, গলায়, পাউডার লাগাতে লাগাতে নীলিমা বলল, প্রশংসা শুনতে চান? শুনুন তবে—"কী চরিত্রচিত্রণে, কী ভাষার আলিম্পনে, লেখক এমন নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন যাহা পাঠককে মুগ্ধ করিবেই। ঘটনা সাবলীল গতিতে বহিয়া গিয়াছে স্বচ্ছন্দস্রোত নদীর মতো; তীরে তীরে তরঙ্গগুলি আঘাত খাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রগুলিই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—" কী মশাই, দৈনিক কাগজের সমালোচক হতে পারি না?

সুধাময় বললে, তোমার ভালো লাগেনি তবে?

—ওমনি মুখখানা কালো হ'ল তো? লেগেছে, লেগেছে। কিন্তু মেয়েটার পরিণতি অমন হ'লো কেন।

কথায় কথায় তর্ক জমে উঠলো। নীলিমার অনেক কিছু পড়া ছিল। কিন্তু সুধাময়ের সঙ্গে তর্কে পারলো না। তবু ওর আলোচনা করার স্বাচ্ছন্দ্য সুধাময়ের মনে গভীর রেখাপাত করল। স্নেহ, প্রেম, মাতৃত্ব, এমনকি জটিল সেক্স সমস্যা নিয়ে কোন মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে এমন অনায়াসে, বিন্দুমাত্র আরক্ত না হয়ে, আলাপ করতে সুধাময়

বুঝে দেখেনি। কথায় কথায় মাতৃত্বকে নীলিমা যখন খুব উঁচু আসন দিল, সুধাময় তখন হেসে ফেলল।—এ বিষয়ে কিন্তু তোমার মত প্রামাণ্য বলে গৃহীত হবে না। বরং তোমার দিদির অভিজ্ঞতা আছে, তাঁর মতামতই জিজ্ঞাসা করো।

উমা জানালায় কাঁথা শুকতে দিচ্ছিল। সুধাময়ের কথা ওর মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে দিল। বললে, আমি কী জানি!

হঠাৎ নীলিমার দৃষ্টি পড়ল সুধাময়ের গেঞ্জির দিকে।—ঈস্, একেবারে ঘামে নেয়ে উঠেছেন যে। গেঞ্জিটা ছাড়ুন দেখি। শিল্পী মানুষ আপনি, এমন নোংরা জামা পরে থাকা আপনাকে কি মানায়? দিন, কেচে দিই।

স্মিতমুখে সুধাময় গেঞ্জিটা খুলে দিল। "আপনি শিল্পী" কথাটা সঙ্গীতের মতো বাজলো কানে। পৃথিবীতে যে সব মানুষ দালালি করে, হিসেব লেখে, ভোটে জেতে, সেই বর্ণহীন বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতো তার যে একটা অপরূপ, স্বতন্ত্র শিল্পীসত্তা আছে, একথার স্বীকৃতি শুনল আজ প্রথম।

আর গেঞ্জি ছিল না। কী ভেবে সুধাময় ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবিটা নামিয়ে পরে নিল। খালি গায়ে রোমশ বুকে বসে থাকাটা কেমন যেন স্থূল মনে হ'ল। বহুদিন শাবান দিয়ে স্নান করে নি। সেদিন সুধাময় সন্ধ্যাবেলা অনেক্ষণ ধরে শাবান মাখলো: ভারি চমৎকার গন্ধ। অনেকক্ষণ উন্মনা রাখে।

রাত্রে কাজের চাপ ছিল প্রচুর। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাল রাখা সোজা নয়।

শেষ রাতে কাজ সারা হ'লে সুধাময় ছাতে উঠলো। জোলো দুধের মতো ফিকে জোৎস্নায় ধোয়া শহরটাকে দেখাচ্ছে গগন ঠাকুরের কিউবিষ্ট ছবির মতো; মাছের আঁশের মতো ছড়ানো মেঘের নিচে দূরে

হাওড়া ব্রিজটা যেন প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় কোন জন্তর কঙ্কাল। গঙ্গার জলের ওপরে সামান্য কুয়াশা জমেছে : স্বচ্ছ আয়নার ওপর কার নিঃশ্বাস পড়েছে যেন।

দুই

সে মাসে সুধাময়ের তিনটি গল্প বেরুলো বিভিন্ন পত্রিকায়। আগে কলম ছুঁতেই চাইতো না, এখন কোথা থেকে একটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। জীবনের এতদিক আছে, এত কথা লেখার আছে, এটা সুধাময় যেন আগে কখনো উপলব্ধি করে নি। ওর চোখের সমুখ থেকে একটা অন্ধকার পর্দা যেন উঠে যাচ্ছে। গল্পগুলির প্রশংসাও হ'ল, কিন্তু তাতে সুধাময়ের মন উঠল না। সম্পাদকেরা বেশি বলেন না, "বেশ, হয়েছে" "আরেকটা দিন" ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত রায়েই কাজ সারেন। সুধাময়ের লোভ তার লেখার সমালোচনা হোক না, প্রতিটি গল্পের কাঠামোর, চরিত্র পরিকল্পনার বিশদ বিচার হোক ; মৌখিক প্রশংসায় মন ভরে না। মন ভরেছে কিন্তু একজনের, উমার। খুশিতে সে ছল ছল করছে।—তিনটে গল্প বেরিয়েছে এ মাসে ? কত করে দেবে ? ধরো সবশুদ্ধ একশো ? বেশিও হতে পারে ? তবে আমি তা থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে মায়ের বাড়ি পুজো দেবো কিন্তু।

আর খুশি হয়েছে নীলিমা। রোজ স্কুল থেকে ফিরে কোমর বেঁধে আলোচনায় লেগে যাবে। কোন্ চরিত্রটা একটু খাপছাড়া হ'য়েছে, কোন্ গল্পটির ট্রিটমেণ্ট আরেকটু নতুন ধরণের হ'লে ভালো হ'ত। গল্পের শেষে সারপ্রাইজ থাকাটা ভালো, না চীপ্। সুধাময়ও সোৎসাহে ওর সঙ্গে তর্ক করে। পরবর্তী গল্পের প্লট, যেটা মাথায় এসেছে, সেটা আরেকটু মাজা ঘষা দরকার, তাই নিয়ে আলোচনা করে।

"নবাঙ্কুর" বাগজখানা থেকে যে দক্ষিণা এলো সেটা সুধাময়ের মতো মাঝারি লেখকের পক্ষে একটু আশাতীতই। অফিস থেকে সুধাময় বাড়ি ফিরছিল। পাঁচটা দশটাকার নোট তখনো পকেটে খস খস করছে, "নবাঙ্কুর" সম্পাদকের প্রশংসা বাজছে কানে। কী ভেবে সুধাময় একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে একখানা শাড়ি কিনলো পঁচিশ টাকা দিয়ে। উমাকে অনেকদিন কিছু কিনে দেয়নি। তখন মনে পড়ল নীলিমার কথা। কী দেবে নীলিমাকে। বইয়ের দোকানের শো-কেসে ইংরিজি একটা কাব্য সংকলন রয়েছে। কিছুদিন আগে আলোচনা প্রসঙ্গে নীলিমা বইখানা সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিল। আটটাকা দিয়ে সেই বইটা নিলে সুধাময়। কম্পিত দ্রুত হাতে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে নীলিমার নামে উপহারও লিখলে।

শাড়িটা উমা কতবার যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তার ইয়ত্তা নেই। খুশিতে মুখখানা টস্‌টস্‌ করছে।—তোর জামাইবাবুর যেমন খেয়াল নীলি। তিন ছেলের মা-কে কি এমন পোষাকে মানায়, এমন রঙীন শাড়িতে?

বইয়ের মোড়কটা সুধাময়ের হাতেই ছিল। উমা জিজ্ঞাসা করলে, ওটা কী।

—ইংরিজি কাব্যের একটা anthology. ও তুমি বুঝবে না।—সুধাময় বললে, নীলিমার দিকে বইয়ের মোড়কটা বাড়িয়ে দিয়ে,—ওর জন্যে এনেছি।

৭

এর পরে সুধাময়ের জীবনটা যেন খরস্রোতে এগিয়ে গেল। প্রতিদিন ডাকে নতুন নতুন লেখার তাড়া আসছে, সেগুলোকে প্রাপ্তির তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখার ভার নীলিমার। প্রতিদিন নতুন নতুন কাগজ আসছে, সেগুলি থেকে সুধাময়ের রচনাগুলি কেটে ফাইলে গেঁথে

রাখছে নীলিমা। এমন কি ছু' চারজন সম্পাদককে চিঠির জবাবও নীলিমাই দিচ্ছে, সুধাময়ের কাজ কেবল নাম সই।

সুধাময় মাঝে মাঝে আপশোষ করে, আমার যদি আরো ছু'টো হাত থাকতো নীলিমা। তবে হয়ত এই চাহিদার যোগান দিতে পারতুম।

ইতিপূর্বে সুধাময় একটা উপন্যাস শুরু করেছিল, আলস্যে সেটাতে অনেকদিন হাত দেয়নি, এবারে ধুলো ঝেড়ে সেটাকে সম্পূর্ণ করতে লেগে গেল। প্রকাশকরা তাড়া দিচ্ছে। ছোট গল্প চান সম্পাদকেরা, প্রকাশকেরা উপন্যাস। একশো টাকা আগামও দিয়েছে। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে ছু'একটা সাহিত্য সভা থেকে আহ্বান এসেছে। পরিচিতির পরিধি এখন অনেক ছড়ানো।

উপন্যাসখানার কিন্তু বেশি প্রশংসা হ'ল না। একখানা কাগজ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলে, সুধাময়ের প্রতিভা আসলে ছোট গল্পের। উপন্যাসে যে অভিজ্ঞতার প্রসার, দৃষ্টির বিস্তৃতি প্রয়োজন, সুধাময়ের তা নেই।

বহুদিন নির্জলা স্তুতির পর এই প্রথম সামান্য বিদ্রূপ সমালোচনায় সুধাময় ক্ষেপে গেল।

নীলিমাকে বললে, হিংসে, হিংসে। এই কাগজটায় কম টাকায় গল্প দিইনি বলে ঝাল ঝেড়েছে। ওর দলীয় একটা কাগজে নীলিমার বেনামীতে একটা আগাগোড়া স্তুতিপূর্ণ সমালোচনা পাঠিয়ে তবে সুধাময় সুস্থ হ'ল।

উপন্যাসখানার বিশেষ প্রশংসা হ'ল না বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে সুধাময়ের ছু'টি গল্প সংগ্রহ বেরুলো। কাগজগুলো এবারে সমস্বরে প্রশংসা করলে। পুরনো গল্প যা ছড়ানো ছিল বিভিন্ন কাগজের পাতায় তা একত্রে গ্রথিত করে সুধাময় কৃতার্থ করেছে সাহিত্যকে।

উপন্যাসটা উমাকে উৎসর্গ করেছিল। উমা পাতা উল্টে নিজের নাম দেখে খুশি হ'ল; আবার রেখে দিল। আসলে সুধাময়ের সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে উমার কোনদিনই বিশেষ যোগ ছিল না। প্রাইভেট ট্যুইশন করে সংসারে যেমন ক'টা বাড়তি টাকা আসে, গল্প লিখেও সুধাময় তেমনি গোটাকয়েক টাকা মাঝে মাঝে আনছে, এতেই সে খুশি। তার বেশি না। তা ছাড়া সুধাময় লেখক হিসাবে ছিল বড়ো অনিয়মিত। কিন্তু কোথা থেকে এলো নীলিমা, সুধাময়ের শিল্পী সত্তাকে আবিষ্কার করল। এত নাম, এত টাকা, এত ফুলের মালা, কোথায় ছিল এসব, নীলিমা যখন আসেনি ?

একবার একটা সাহিত্যসভায় সুধাময় পৌরহিত্য করলে। উদ্যোক্তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে উমাকেও যেতে হয়েছিল। গান, প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদির পর সুধাময় উঠে দাঁড়িয়ে অভিভাষণ দিতে শুরু করলে। সুধাময় যে এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে, উমা জানত না। পারিবারিক জীবনে তার স্বামী বরাবরই একটু লাজুক, স্বল্পভাষী। আজ মুগ্ধ হয়ে উমা শুনে যেতে লাগল। সব কথার মানে ঠিক বুঝল না, কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর মুগ্ধদৃষ্টি আর বক্তৃতা শেষের হাততালি থেকে অনুমান করলে, বক্তৃতাটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

সভাশেষে ওদের আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে চায়ের আয়োজন। আরো পাঁচজন ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই উমার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। উমার তাতে ভারি অস্বস্তি। এরা যে ভাষায় কথা বলছে, সেটা সে ভালো বোঝে না, যদিও অনুমাত্র সন্দেহ নেই ভাষাটা বাংলা।

ঝলমল পোষাক একটি মেয়ে, ঠিক বোঝা যায় না বিবাহিত, না অবিবাহিত, মৃদুকণ্ঠে উমাকে জিজ্ঞাসা করলে: আপনি সুধাময়বাবুর স্ত্রী ?

সলজ্জ ঘাড় কাৎ করল উমা। মেয়েটি অনেকক্ষণ উমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর আরো কত যে প্রশ্ন করল তার ইয়ত্তা নেই। সুধাময়বাবু প্রথম লিখতে শুরু করেন বিয়ের আগে না পরে। আপনার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। সব কিছু লিখে কি প্রথমে আপনাকে শোনান, না সোজা পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন। কী বই বেশি পড়েন সুধাময়বাবু, সাহিত্য না ইতিহাস? সোসিওলজি না সাইকোলজি। ফিক্‌সন না ক্রিটিসিজ্‌ম।

উমা ঘেমে উঠছিল। সব কথারই হুঁ-হাঁ জবাব দিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এভাবে কতক্ষণ চলে। মেয়েটি যখন জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না আপনার স্বামী সেক্স কন্‌শাস্ যত, সোসিয়ালি কন্‌শাস্ ততটা নন, তখন উমা ভালোমন্দ, হাঁ, না কিছুই বললে না।

—বুঝেছি, এ প্রশ্নের জবাব আপনি ঠিক দিতে চান না। আচ্ছা, গল্পলেখক হিসেবে সুধাময়বাবুর সঙ্গে কার সবচেয়ে বেশি মিল আছে বলে মনে হয় আপনার? শেকভ্‌ না মোপাসাঁ। ম্যম্ না ও' হেনরি। লোকে যে বলছে সুধাময়বাবু গল্প লেখার টেকনিকের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে টেগোর স্কুলকেই রিভাইভ্‌ করতে চেষ্টা করছেন, আপনারও কি তাই মত? আমার কিন্তু মনে হয় না। প্রথমতঃ ছোট গল্পের ক্ষেত্রে কোন টেগোর স্কুল আছে কি না, তাতেই আমার সন্দেহ। শরৎচন্দ্রও "গল্প গুচ্ছের" ধারায় গল্প রচনা করেননি, প্রভাত মুখুয্যেও না।

ভাগ্যিস বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব মেয়েটি নিজেই দিয়ে যাচ্ছে, নইলে উমা কী মুশকিলেই পড়ত। মোটরে উঠতে সকলে ওকে আর সুধাময়কে নমস্কার করল; উমা তাতে বিব্রত। ওদের দৃষ্টিতে যেন বিদ্রূপ রয়েছে প্রচ্ছন্ন। এই সাদাসিধে ভালো মানুষ বোকা মেয়েটি যে ক্ষুরলেখনী সুধাময় মিত্রের স্ত্রী, এইটেই যেন ওদের কাছে পরম বিস্ময়।

গৌরবে উমার বুক ভরে উঠেছিল। মোটিরে উঠে সুধাময়ের একখানা হাত সাগ্রহে চেপে বললে, তুমি যে বক্তৃতা দিলে কিছুই বুঝিনি কিন্তু। একটু বুঝিয়ে দেবে ?

সুধাময় উন্মনা হয়ে কী ভাবছিল। বললে, বুঝতে তোমাকে হবে না। তুমি বুঝতে পারবেও না।

সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে উঠেছিল উমার। কে-যে বুঝতে পারবে, সেটা সুধাময়কে জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। জবাব তার বুঝি জানাই আছে।

বাড়ি এসে পোষাকি কাপড়-চোপড় ছেড়ে উমা বরং একটু স্বস্তি পেল। ছোট খুকী নোংরা ঘাঁটছিল। তাকে একটা চড় কসিয়ে গা ধুইয়ে দিতে কলতলা নিয়ে গেল। জল ঢালার ঝর্ঝর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল সুধাময় নীলিমাকে আজকের সভার বিস্তৃত বিবরণ শোনাচ্ছে। আবার চড় কসালে খুকিকে। ওর কান্নায় আর জলের ঝর্ঝরে ওদের কলকূজন ডুবে যাক্।

উমা মনে করেছিল, কিছু কিছু পড়াশুনা শুরু করবে। কিন্তু একে সংসারের কাজ করে সময়ে কুলোয় না, তাতে আবার শরীরটা ক্রমশঃই অশক্ত হয়ে উঠছে। সুধাময়কে পঞ্চম সন্তান উপহার দেবার দায়িত্ব নিয়েছে প্রায় সাতমাস হল। আর মাস দুই পরেই চুক্তি অনুযায়ী হাসপাতালে যেতে হবে।

একদিন নীলিমা এসে বললে, বোর্ডিংয়ে সীট হয়েছে জামাইবাবু। আসছে মাসের পয়লা যেতে হবে।

সুধাময় খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বললে, সিট খালি হলেই যেতে হবে তার কি মানে আছে ? এখানে কি কোন অসুবিধে হচ্ছে ?

—অসুবিধে নয়। তবে ওখানে আমাকেই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট করে দেবে। থাকা-খাওয়ার খরচ তো লাগবেই না, একটা এলাউন্সও পাওয়া যেতে পারে।

সুধাময় তখন আর কিছু বললে না। রাত্রে উমা বললে, নীলি যেতে চাইছে তুমি বাধা দিও না বাপু। ওর নিজের উন্নতি ও দেখবে না?

সুধাময় শুকনো গলায় বললে, আচ্ছা।

যাবার দিন দুপুরে নীলিমা সুধাময়কে প্রণাম করলে। সুধাময় তখন অফিসে বেরুচ্ছিল।

—আজ বিকেলে চলে যাচ্ছি।

—আজ? কতকটা অন্যমনস্ক সুরে বললে সুধাময়,—ওঃ আজই? তারপর খানিকক্ষণ নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।—আমার প্রুফ দেখতে ভারি অসুবিধে হবে কিন্তু।

নীলিমাও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। বললে, মাঝে মাঝে আসব। প্রুফ পড়ে দিয়ে যাবো।

সুধাময় একখানা হাত নীলিমার পিঠে রাখলে: আচ্ছা চলি। কিন্তু দশবারো সেকেণ্ড কেটে গেল, সুধাময় গেলও না, হাতটাও নিল না সরিয়ে। নীলিমা একবার চোখ তুলে তাকালো সুধাময়ের চোখে, কিন্তু সেই চোখ নামিয়ে নিতে হ'ল পলকেই। চোখের ভাষা পড়ে নিতে ভুল হ'ল না সুধাময়ের।

—চলি নীলিমা। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো সুধাময়। সারা দুপুর অফিসে কাটলো অত্যন্ত অস্বস্তিতে। রোদনভরা এমন বসন্ত এর আগে কখনো আসেনি। বিকেলে এলোমেলো ঘুরলো খানিকক্ষণ। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই সিনেমা দেখলে একটা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না, গিয়ে তো দেখবে কোলের বাচ্চাটা চেঁচাচ্ছে, উমা তাকে মারছে; রোগা, ফ্যাকাশে টিঙটিঙে হয়েছে উমা, তারপর

আজকাল আবার মধ্যদেশ স্ফীত হয়ে আরো বীভৎস হয়েছে। আর নেই সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়েটি, যে তার সমস্ত কাগজপত্র ঠিক করে রাখে, প্রুফ দেখে, সাহিত্য আলোচনা করে।

প্রায় সাড়ে দশটায় বাসায় ফিরলো। নীলিমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে বিস্মিত হয়ে ভেজানো দরজাটা একটু ঠেললে সুধাময়। নীলিমা তো যায় নি। কী একটা বই বুকের ওপর আধখোলা পড়ে আছে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছে নীলিমা। আস্তে আস্তে সুধাময় নিজের ঘরে চলে এলো। উমা তখন হাওয়া করে মশা তাড়িয়ে মশারির ধার গুঁজছিল। সুধাময় এসে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অবাক হয়ে উমা জিজ্ঞাসা করল, হাত মুখ ধুলে না ?

না। লঘুকণ্ঠে সুধাময় বললে. নীলিমা যায় নি ?

উমা বললে, যেতে আর পারলো কই। আজ সন্ধ্যাবেলা ও যখন যাবে, গাড়িও ডেকে এনেছে, আমার কী-রকম ব্যথা উঠলো একটা। ও আর যায় কী করে। সেই গাড়িতে করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বললে প্রিমেচিওর পেইন। আবার ফিরে এলাম। নীলিরও আজ যাওয়া হ'ল না।

আবেগে সুধাময় উমাকে কাছে টেনে নিল অনেক দিন পরে। ওর সমস্ত মুখ অজস্র চুম্বনে ভরে দিল। ঈষৎ অবাক হ'ল উমা। বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলো সুধাময়ের মুখের দিকে।

উমার একখানা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সুধাময় বলল, আমি বলি কী উমা, নীলিমা এখন নাই বা গেল।···তোমার শরীরের এই অবস্থা···আগে খালাস হয়ে এসো ; তারপর না হয়···

বিচিত্র কঠিন একটুখানি হেসে উমা বললে, ওঃ আচ্ছা।

হাসপাতাল থেকে উমা ফিরে এলো আরো রোগা হয়ে। চুলগুলো সব উঠে গেছে, মাত্র সেদিন তৈরী করা সেমিজটাও ঢিলে লাগছে গায়ে।

ডাক্তার অনেক ওষুধ আর পরিপূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন। সংসারের ভার নিয়েছে নীলিমা। ক্ষিপ্র, লঘু হাতে সব করে যাচ্ছে, ঠাকুরের রান্নার তদারক থেকে সুধাময়ের অফিসে যাবার জামায় বোতাম লাগানো অবধি। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে উমার ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে গুছিয়ে পার্কে পাঠাচ্ছে। ফিরে এলে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে, কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। একদিনের জন্যে মাথাটুকুও ধরে না নীলিমার। বিধাতার কাছ থেকে সে অফুরন্ত স্বাস্থ্যের সঞ্চয় নিয়ে এসেছে।

আর উমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে, রুগ্ন শয্যায় এর চেয়ে ভালো সঙ্গী আর নেই। সাহিত্য পাঠে কিছু কিছু উৎসাহ বোধ করছে আজকাল। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা শেষ করে এখন কৃষ্ণকান্তের উইলে এসে ঠেকেছে। এই অল্প অল্প পড়তে পড়তেই, উমা আশা করছে, একদিন সাহিত্যলোকের সব চাবি তার কাছে খুলে যাবে।

পাশের ঘর থেকে সুধাময় আর নীলিমার গলা ভেসে আসতেই উমা সচকিত হয়ে উঠল। খিল খিল হাসিও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আস্তে আস্তে উঠে এলো উমা। দেয়ালে কান পাতলে। উপরে স্কাইলাইট আছে দু'টো ঘরের ভেতর, অস্পষ্ট হলেও সব কথা শোনা যায়।

—কীট্স ভালো লাগছে না, এসো বার্নস্ পড়ি, নীলা।

—কী বললেন, নীলা?

—হ্যাঁ। সকলের যা সয় না।

—আপনার তো সয়েছে।

তারপর আবার খিল খিল হাসি। উমা ফিরে এলো। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ছিল বালিশের ওপর। অপরিসীম বিতৃষ্ণায় সেটা দূরে ঠেলে দিলে।

খানিকপরে সুধাময়ের বেরিয়ে যাবার আভাস এলো। উমা ঝিকে দিয়ে নীলিমাকে ডেকে পাঠালো। নীলিমা আসতেই বললে, তুই কবে বোর্ডিংয়ে যাবি নীলি?

বিস্মিত, উৎসুক চোখে তাকালো নীলিমা: তার বোর্ডিংয়ে যাবার তো কথা নেই। সে তখন যায়নি বলে তার জায়গায় নতুন একজন টীচারকে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট করা হয়েছে। আর সিট খালি নেই।

উমা হাঁপাচ্ছে। ফ্যাকাশে গালে ছাপ ছোপ রক্ত। তীক্ষ্ণ, চিকণ গলায় নীলিমাকে বললে, না তুই কালই চলে যা। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। শরীরও আমার সেরে উঠেছে। তোর আর থাকার দরকার কী!

এতক্ষণে নীলিমা বুঝেছে জুতোর কাঁকর কোথায়। একটা দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল ওর মুখে।

—জামাইবাবু মত দেবেন না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে উমা বললে, তোর জামাইবাবুর মত আমি নেবো। তুই যাবি কি না বল্।

ধীর, শান্ত, কঠিন গলায় নীলিমা বললে, না।

যাবি না? সব ভুলে গিয়ে উমা চীৎকার করে উঠে বসল। শিথিল শাড়িটা খসে পড়ল কোমরের কাছে, যাবি না? এখানে বসে বসে ভগ্নীপতির মাথা খাবি? উমা উত্তেজিত হয়ে হাতের কাছে ছিল ফীডিং কাপ, সেটাই তুলে ছুঁড়ে মারলে। মাথাটা সরিয়ে নিল নীলিমা, তবু কপালের কাছে খানিকটা কেটে গেল, আর মেজের ওপর কাপটা পড়ে চুরমার হয়ে গেল সশব্দে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল উমা বিছানার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, ছেলে মেয়েগুলো চীৎকারের শব্দে ছুটে এসেছিল, তারা মাকে ঘিরে কাঁদতে শুরু করে দিলে।

সেদিনকার এই কুৎসিত ঘটনার পর থেকে নীলিমা ও উমার মধ্যে একেবারেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। পরস্পরের সামনাসামনি এলেই ওদের দু'জনের চোখ থেকেই তীব্র ঘৃণার ফুলকি ঝরতে থাকে। পারলে বুঝি একে অপরের টুঁটি টিপে ধরে, কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত কোন কথা বলে না। একই বাড়িতে থেকেও দুজন স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে।

তিন

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই সুধাময় নীলিমাকে বললে, আজ একটা সুখবর আছে।

উৎসুক চোখ দু'টি নেচে উঠলো নীলিমার।—কী খবর।

পকেট থেকে একটা চেক বার করে সুধাময় বললে, পড়ে দেখ।

হাজার টাকার চেক। নীচে কী একটা ফিল্ম কোম্পানীর মালিকের নাম সই করা।

নীলিমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে সুধাময় বললে, আমার বই ফিল্মে উঠছে যে। "সীমান্ত" বইখানা, তিন হাজার টাকা। তার মধ্যে এই হাজার টাকা আগাম। প্রথম বই, এটা যদি চলে, পরের বইটাতে আরো ঢের বেশি পাওয়া যাবে।

—সিনেমায়?

—আবার কী।

একটু দম নিয়ে সুধাময় বলল, অবিশ্যি ওরা গল্পটা একটু বদলাবে শেষের দিকটা···

বদলাবে? বিস্মিত কণ্ঠে বললে নীলিমা।

হ্যাঁ। শেষের দিকে একটা বিয়ের সীন দেবে। নইলে গল্পটা দর্শক নেবে না। হতেও পারে, বোকাবোকা হেসে সুধাময় বললে, হতেও পারে,···সিনেমার টেক্‌নিক আমি ঠিক বুঝিনে তো।

সুধাময়ের গল্পটার পরিণতিতে, নীলিমার মনে পড়ল, স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ইচ্ছে করেই সুধাময় একটু সংশয় রেখে দিয়েছিল, বলেছিল ঐটুকুই আর্ট। পরে কী হবে . সেটা পাঠকেরা কল্পনা করে নিক। বিয়ে দেওয়া ঘটকের ব্যবসা, লেখকের নয়। সেই সুধাময় আজ অনায়াসে নিজের কাহিনীর মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে এসেছে!

—কই, তুমি কোন কথা বলছ না যে। তুমি কি সুখী হওনি?

—হয়েছি। আস্তে আস্তে ঘর থেকে নীলিমা বেরিয়ে এলো।

ঈষৎ অবাক হ'ল সুধাময়। নীলিমা খুসী হয়নি বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কেন। এ নিয়ে বেশী ভাববার অবসর নেই। আজকের দুপুরের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যটুকু ওর মস্তিষ্কে তখনো মদের নেশার মতো কাজ করছে। কী চমৎকার কথা বলতে জানেন প্রতুলবাবু। অতো বড়ো প্রোডিউসার, হাতে চারটে হীরের আংটি পরে জমকালো গাড়ি চড়ে এসেছিলেন। প্রাথমিক আলাপাদির পর একটা হোটেলে নিয়ে গেলেন তাকে। সেখানে পানীয়ের মধ্যে চা ছাড়া আরো কিছু মেলে। প্রথমটা ইতস্তত করেছিল সুধাময়, শেষটা প্রতুলবাবুর ঝুলোঝুলিতে পড়ে দু'এক চুমুক খেতেও হয়েছিল তাকে। দু'টো গ্লাসে ঠোকাঠুকির পর প্রতুলবাবু বলেছিলেন, আমাদের নতুন বন্ধুত্ব এই গ্লাস দু'টির মতো ভরে উঠুক। প্রাথমিক সঙ্কোচ সুধাময় ইতিমধ্যেই হাঁসের মতো গা ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলেছিল। খাবে না কেন? দুগ্ধপোষ্য শিশু নয় তো! সে কাকে পরোয়া করে?

সুধাময়ের জীবন পালতোলা নৌকার মতো এগিয়ে গেল। ভাবতে মাঝে মাঝে নিজেরি অবাক লাগে। কোথায় ছিল সাব-এডিটর, খবরের তর্জমা করে মাসের শেষে দেড়শো টাকা পেতো, মাঝে মাঝে এক আধটা গল্প লিখে উপরি দশ বিশ টাকা। আর আজকাল গল্প উপন্যাস, ফরমাস আসছে তো আসছেই। ভীড় কমাতে রেট্ বাড়িয়ে দিয়েছে সুধাময়. প্রতিটি গল্পের দক্ষিণা চল্লিশ, সত্তর এমন কি কখনো কখনো একশো টাকা পর্যন্ত নিয়েছে, তবু লোকের ভীড় কমেনি। আর কাগজের সংখ্যাই কি কম। ইতিমধ্যে ওর দু'একটি লেখা ভাষান্তরিত হয়ে প্রদেশান্তরেও আদৃত হয়েছে। নীলিমা অবশ্য বলেছিল আজকাল ওর লেখার ধার ভোঁতা হয়ে এসেছে। চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে সুধাময় নাকি অত্যন্ত বেশি লিখছে, এবং ফলে হয় কিছুই লিখছে না, নয়ত নিজেরই পুনরাবৃত্তি করছে।

নতুন বইটার শূটিং আরম্ভ হয়েছে আজ কয়েকদিন থেকে। সুধাময়কে আজকাল প্রায়ই স্টুডিয়োতে যেতে হয়। নতুন একটা জগৎকে একটু একটু করে চিনছে সুধাময়, একটু একটু চাখ্ছে, যত চাখ্ছে ততই যেন অপরূপ লাগছে। এ জগতে প্রত্যেকটি লোক কী নিখুঁৎ, চলনে বলনে পোষাকে-আসাকে একেবারে ছিম্‌ছাম। ওদের পাশে নিজেকেই মাঝে মাঝে কেমন গ্রাম্য মনে হয় সুধাময়ের। আর সবচেয়ে আশ্চর্য বুঝি অলকা মুখার্জী। সুধাময়ের গল্পের হিরোয়িন।

প্রথম দিন প্রতুল বাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একটা হোটেলে।

সেই রোমাঞ্চকর অপরাহ্ণটির কথা মনে পড়লে এখনো রক্তস্রোত সুধাময়ের রুদ্ধ হয়ে আসে। সুরূপা নারী জীবনে আরো অনেক সে দেখেছে, কিন্তু অলকার মতো ? দীর্ঘ আঁখিপল্লবের ছায়ায় আরক্তিম কপোল দু'টি বিশ্রাম করছে ; ঈষৎ শীর্ণ অলকার দেহ, নীলিমার মতো

কানায় কানায় ভর্তি নয়। কিন্তু ওর ওষ্ঠাধরে দক্ষিণ ইতালীর দ্রাক্ষাকুঞ্জের পরিপূর্ণ ফলের আভাস আছে। দুই চোখে আছে নির্মেঘ, নীল দিগন্ত।

হাত তুলে নমস্কার করল সুধাময়। অলকা প্রতিনমস্কার করল।

প্রতুলবাবু ফিস ফিস করে বললেন, "সোসাইটি গার্ল"। কথাটা সুধাময়ের কানে বসন্তের মদির অপরাহ্নে চৌরঙ্গীর পথে অজ্ঞাত পথচারীর চকিতে এসে কানে কানে বলে যাওয়া 'কলেজ গার্লের' মতো শোনালো। প্রতুলবাবু বললেন, ওর মধ্যে এমন একটা সহজাত আভিজাত্য আছে, যেটা আপনি আর পাঁচটা অভিনেত্রীর মধ্যে পাবেন না। বেশি শেখাতে হয় না, সহজেই বুঝে নেয়।

—রিয়েলি! স্তুতি শুনে ঝিলিক দিয়ে উঠলো অলকার কানের দুল দুটি। আই সে চৌধুরি, ইউ উড্ কিল্ মি উইথ ফ্ল্যাটারি। তর্জনী দিয়ে প্রতুলবাবুর বাহুমূলে আঘাত করে অলকা বললে।

সুধাময়ের সঙ্গে সামান্য আলাপ হ'ল মেয়েটির। সুধাময়ের বইখানা সে পড়েছে। Rather hard stuff I should say, but immensely amusing. বিশেষ করে সুমিত্রার চরিত্রটি।

সুধাময় সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল, বইটা কেমন লেগেছে?

ঝলমল পোষাকে একবার গা ঝাড়া দিয়ে অলকা বললে, Oh it had plenty of fun.

কথাটা একটু অদ্ভুত শোনালো সুধাময়ের কানে। Plenty of fun? কথাটা স্তুতি কি না ঠিক বোঝা গেল না। অন্তত: এ ভাষায় সুধাময়ের গল্পের কেউ সমালোচনা এর আগে করে নি।

যাবার আগে অলকা সুধাময়কে ওর বাসায় যেতে একদিন নিমন্ত্রণ করল: সুমিত্রার ভূমিকায় নামছে অলকা, চরিত্রটার ইনটারপ্রেটেসন ঠিক হচ্ছে কি না, সুধাময় একটু যদি গিয়ে শুনে আসে।

সুধাময় একটু ইতস্তত করে বললে, যাবো? মানে, আপনার বাড়িতে···অন্ত সবাই···

অর্থাৎ, শুনেছিল অলকা ভদ্রঘরের মেয়ে; ওর অভিভাবকরা সুধাময়ের যাওয়াটা পছন্দ করবেন কি না, সুধাময়ের এই ছিল জিজ্ঞাস্য। প্রশ্নটা আন্দাজে বুঝে নিয়ে অলকা বললে No damned fear.

ডিরেকটার মন্মথ চক্রবর্তী কিন্তু আসল পরিচয় শুনিয়েছিল সুধাময়কে আর একদিন এই হোটেলে বসেই। সোসাইটি গার্ল? নাক সিঁটকে মন্মথ বললে, ব্যালে গার্ল ছিল মশাই, ওকে ডিস্‌কভার করেছি আমি। আজ না হয় প্রোডিউসারের সঙ্গে ভিড়ে নামের শেষে মুখার্জী জুড়ে লেডি হয়েছে।

সেদিন মন্মথ কী একটা কারণে চটে ছিল প্রতুল চৌধুরী আর অলকা দু'জনের ওপরই। সুধাময়কে সাবধান করে দিলে, ওসব দলে বেশি মিশবেন না মশাই, আপনার শাঁস চুষে ছোব্‌ড়া করে ফেলে দেবে।

কিন্তু তখন সুধাময় অনেকদূর এগিয়েছিল।

বিকেলে স্নান সেরে সুধাময় দেয়ালের আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার মাখছিল, আয়নায় কার ছায়া পড়ল, ফিরে তাকিয়ে দেখল, উমা।

এ ক'মাস ভুগে ভুগে শরীর আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে উমার। শাদা একটা পর্দার মতো দুলতে দুলতে এলো।

—বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলো সুধাময়: তোমার কাছে অনুমতি নিতে হবে নাকি?

আহত দৃষ্টিতে উমা সুধাময়ের দিকে তাকালো: না, এমনি, জিজ্ঞাসা করছিলুম। আমার একটা ওষুধ এনে দেবে? এদিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—আমার সময় নেই। অন্য কাউকে দিয়ে আনিও। পকেট থেকে দশটাকার একটা নোট বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুধাময়।

নীচু হয়ে উমা টাকাটা কুড়িয়ে নিল। তারপর টলতে টলতে আবার বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে সুধাময় স্বগত একটা ইংরাজী শপথ উচ্চারণ করলে। এই কাঁকলাসটার সঙ্গে যে তার বিয়ে হয়েছিল, একথা আজ অবিশ্বাস্য লাগে। প্রেয়সী উমা কোনদিনই ছিল না: বড়ো জোর ছিল ওর গৃহকর্ত্রী আর সন্তানের স্তন্যদাত্রী। ভুগে ভুগে আজকাল আর সংসারের দেখাশোনা করতে পারে না, আর সন্তানকে দেবার মতো স্তন্য তো ওর নেই-ই।

সেদিন ফেরবার পথে সুধাময় একটা ট্যাক্সি নিলে। অনেক রাত হয়েছিল। চেতনা তখন কারণবারির প্রলয়পয়োধিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে, কেবল দ্বীপের মতো এই অনুভূতিটুকু জেগে আছে—অলকা তাকে ভালবাসে। আজ ওর কাছে সব কিছু কন্‌ফেস্‌ করেছে অলকা: ওর অতীত, ওর বর্তমান; কেবল ভবিষ্যৎটুকু, অলকা বলেছে, সুধাময়ের হাতে। আমাকে বাঁচান, এই মেকি জীবন, এই রঙ্‌মাখান দিন-রাত্রি থেকে দূরে নিয়ে চলুন সুধাময়বাবু। আপনার হৃদয় আছে, প্রতুল চৌধুরীর কারাগার থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। অলকার চোখে সেই ছুরির ঝিলিক, ওষ্ঠাধরে বিম্বফলের আর্দ্র সরসতা।

বাসায় ফিরতে ফিরতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকটা সুস্থ বোধ করছিল সুধাময়। মাথাটা আর ঘুরছে না, টলছে না পা দু'টো। চাকরবাকরেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল, দরজা খুলে দিলে নীলিমা।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি উঠতে উঠতে সুধাময়ের কী রকম সঙ্কোচ হচ্ছিল। নীলিমা কোন কথা বলছে না, ওদের দু'জনের পায়ের আওয়াজে কাঠের সিঁড়িটাতে অদ্ভুত একটা আর্তনাদ উঠছে। অস্বস্তিকর সেই নীরবতা সুধাময় আর সহ্য করতে পারছিল না। নীলিমার ঘরের সম্মুখে এসে নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বললে, শূটিংয়ে আজ ভারি দেরি হয়ে গেল।

নীলিমা বললে, ও।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সুধাময় আবার বললে, তুমিও একদিন শূটিং দেখতে চলো না নীলা। ভারি ইন্টারেষ্টিং। যে কোন দিন যেতে পারো। এখনো অনেকগুলো শূটিং বাকি আছে, এই তো সবে শুরু।

—হ্যাঁ সবে শুরু।—বিচিত্র, নির্জীব স্বরে নীলিমা বললে।

নীলিমা তখনো অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুধাময়ের অবাক্ লাগল। কথাও বলবে না, চলেও যাবে না, কেবল অন্ধকারে চকচকে চোখ দু'টি মেলে রাখবে, এ কেমন ব্যবহার। সুধাময় নিজেও চলে যেতে পারছে না, কোথায় যেন বাধছে। একবার ভাবল নীলিমাকে ঠেলে দেয় ঘরের ভেতরে, সমুচিত শিক্ষা দেয় মেয়েটাকে। একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি জেগেছিলে?

—হ্যাঁ।

—এত রাত অবধি? কেন?

—কবিতা পড়ছিলুম।

সুধাময়ের মনে হতে পারতো মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যদি না একটু থেমে নীলিমা বলত,—আজ পঁচিশে বৈশাখ।

পঁচিশে বৈশাখ? সুধাময়ের মনে পড়ল, ওরা আগে থেকে প্ল্যান করেছিল, এই দিনটিতে দু'জনে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রতিকৃতি ফুলের

মালায় সাজাবে, সামনে জ্বালবে ধূপ। একে অপরকে কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত করবে।

নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সুধাময়ের মন অনুশোচনায় ভরে গেল। মনে মনে হিসাব করল, পঁচিশে বৈশাখ গেছে, বাইশে শ্রাবণ তো আছে। ঐ দিনটি ওরা একসঙ্গে উদ্‌যাপন করবে।

.

কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের মতো বাইশে শ্রাবণও উদ্‌যাপন করা হয়নি। কেন হয়নি, তার আর বিস্তৃত বৃত্তান্ত দেবার প্রয়োজন নেই; প্রথিতযশা কথাশিল্পী সুধাময় মিত্রের সঙ্গে চিত্রতারকা অলকার ঘনিষ্ঠতার কাহিনী তখন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েছিল। দু'পয়সাওয়ালা সাপ্তাহিক-গুলোতে এ নিয়ে মুখরোচক যে সব ছড়া বেরুতো, সিনেমা অনুরাগীরা সেগুলো সাগ্রহে কিনে পড়তেন। এমন কি এ নিয়ে প্রতুল চৌধুরীর সঙ্গে সুধাময়ের মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়ে গেছে, এমন কথাও রটল। লেকে, ময়দানে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কবে, কখন কিভাবে সুধাময় আর অলকাকে একসঙ্গে দেখা গেছে, সে সব কথা রেস্তোরাঁয় কি কলেজের কমন রুমে অনেক ছাত্র অনায়াসে বলে দিতে পারে।

শেষে একদিন এমন কথাও শোনা গেল সুসাহিত্যিক সুধাময় মিত্র সুঅভিনেত্রী অলকা দেবীকে বিয়ে করবে সংকল্প করেছে।

এসব খবর নীলিমার কানেও কিছু কিছু পৌঁছত, দু'একটা সাপ্তাহিকের টিপ্পনীও তার চোখে পড়েছিল। তিন দিন সুধাময় বাড়ি ফেরেনি, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। চতুর্থ দিন সকালে সুধাময় কোথা থেকে এসে উদয় হ'ল। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলল না। দ্রুত হাতে নিজের সুটকেসটা গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে যাবে, ওর পথ আগলে দাঁড়ালো নীলিমা।

—কোথায় যাচ্ছো?

বিরক্ত অসহিষ্ণু গলায় সুধাময় বললে, তা দিয়ে তোমার দরকার কী? পথ ছাড়ো।

—ছাড়বো না পথ। আগে বলো লোকে যা বলছে, তা মিথ্যে। তুমি এত নীচে নেমে যাওনি।

—কী বলছে লোকে?

—বলছে, এই,:··এই···তুমি নাকি একটা রাস্তার মেয়েছেলেকে বিয়ে করবে?

—বিয়ে করব, ঠিকই বলছে, তবে রাস্তার মেয়েছেলেকে নয়। অলকাকে।

নাসিকা কুঞ্চিত করে নীলিমা বললে, একটা সিনেমার এ্যাক্‌ট্রেস, ও বেশ্যা ছাড়া কী?

—চুপ করো। চীৎকার করে উঠল সুধাময়ঃ ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো। অলকা অভিনেত্রী বটে, কিন্তু অভিনয় একটা শিল্প। অলকা শিল্পী, তুমি কী?

—আমি কী? রুদ্ধকণ্ঠে কথাটা আবৃত্তি করল নীলিমা।

—হ্যাঁ, নিষ্ঠুর হেসে সুধাময় বললে, তুমি কে, কী তোমার পরিচয়? ইস্কুলে মাস্টারি করো আর আমার পেছনে ফেউয়ের মতো ঘুরে বেড়াও। তোমার সঙ্গে অলকার কিসের তুলনা?

নীলিমা বিবর্ণ হয়ে গেল, ঠোঁট দুটি একবার শব্দহীন অভিযোগে কেঁপে উঠলো। পথ ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সরে এলো দু'হাতে মুখ ঢেকে। তাকালো যখন, তখন সুধাময় সুটকেশ নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট। টলতে টলতে কোন রকমে বিছানায় এসে উপুড় হয়ে পড়ল।

কতক্ষণ কেটে গেছে হুঁস নেই। হঠাৎ পিঠের ওপর কার করস্পর্শ। চকিত হয়ে ফিরে তাকালো।

—কাঁদিসনে।

রোগশয্যা থেকে উঠে এসেছে উমা। নীলিমার শিয়রে এসে বসেছে। ছ'মাস পরে উমা এ ঘরে আজ এই প্রথম এলো।

হঠাৎ বুকের ভেতর 'কি রকম দুলে উঠলো নীলিমার।—দিদি! অভিভূত, অস্ফুট একটা শব্দ করে উমাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ওর কোলে মুখ লুকোলো। আর উমা, অনেকক্ষণ ধরে, শীর্ণ আঙুলগুলো সস্নেহে নীলিমার চুলে বুলিয়ে দিতে থাকল।

প্রাচীর

নমস্কার ক'রে ভদ্রলোক বললেন, আপনিই মণিময়বাবু ?

মণিময় ঘাড় নাড়তেই ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ওর দু'খানা হাত ধ'রে সজোর ঝাঁকুনি দিলেন। প্রবীণ ভদ্রলোক, কিন্তু কবজিতে রীতিমত জোর আছে। মণিময়ের হাত দু'টো টন টন ক'রে উঠলো।

—উঃ, আপনাকে কি সোজা খুঁজেছি মশাই। কুমিল্লায় গিয়ে শুনি আপনি কুষ্টিয়ায়। কুষ্টিয়ায় গেলে বলে বহরমপুর। বহরমপুরওয়ালারা আবার পাঠিয়ে দিলে সোজা কলকাতায়। আর কলকাতার লোক খুঁজে বার করাও যা, অভিধান দেখে ক্রশওআর্ড পাজ্‌ল মেলানও তা।

মণিময় বললে, আমাকে আপনার কী দরকার বলুন তো ?

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। মাথার চুলের কিছু ঝরেছে, কিছু পেকেছে। মোটা মিলের ধুতির ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি। বুক পকেটে কালোচেন ঘড়ি। এই ধরণের লোকেরা কী চায় মণিময়ের জানতে বাকি নেই। জেনেছে মণিময় বিপত্নীক। সর্বপ্রকারে সুলক্ষণা পাত্রীর সন্ধান নিয়ে এসেছে। এই নিয়ে কলকাতা আসবার পর থেকে বোধ হয় একশো জন হ'ল। এই ভদ্রলোকের যা চেহারা, নির্ঘাত ঘটক। এখুনি নকিবের মত আবৃত্তি করতে শুরু করবে, দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রকৃত সুন্দরী (আঠারো) মধ্যমশিক্ষিত, সূচীশিল্পসুচতুরা, গৃহকর্মনিপুণা—

আশ্চর্য, ভদ্রলোক সে-সব কিছুই করলেন না। পকেট থেকে একটা ফটো বার ক'রে মণিময়ের চোখের সম্মুখে ধরলেন, দেখুন তো চিন্‌তে

পারেন কিনা। মুহূর্তে মণিময়ের মুখখানা শাদা হয়ে গেল। মাথাটা ঘুরে উঠলো, পরিষ্কার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। অতি কষ্টে চেয়ারের হাতল ধ'রে সামলে আড়ষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, এ ফটো আপনি কোথায় পেলেন।

উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক ফটোখানার উল্টো পিঠ দেখালেন। পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে.নিরুপমা চক্রবর্তী। সহস্র-বার সহস্ররূপে দেখা সেই মুখখানি, আর অতি-পরিচিত সেই কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষর। মণিময় বলল, বেঁচে আছে ?

ভদ্রলোক বললেন, আছে।

কোথায় আছে, কী ভাবে আছে, কেমন ক'রে আছে, কিছুই জিজ্ঞাসা করল না মণিময়। অনেকক্ষণ চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। তারপর মাথা তুলে বলল, আবার তা হ'লে ফিরে পাবো ?

—পাবেন। অবশ্য, ভদ্রলোক ইতস্তত ক'রে বললেন, আপনি যদি ফিরে নেন।

যদি ফিরে নেন। অবিশ্বাস্য একটা রসিকতা করছেন ভদ্রলোক। নিরুপমাকে ফিরে নেবে কিনা মণিময়! যে নিরুপমাকে পাবার জন্যে একদা সে অসাধ্য সাধন করেছে; অনিচ্ছুক বাপ-মায়ের সম্মতি আদায় করেছে। যাকে নিয়ে বিয়ের প্রথম পাঁচ বছর কেটে গেছে তৃষিতের গণ্ডুষের মতো—সেই নিরুপমাকে নেবে কিনা মণিময়!

হাঙ্গামার খবর কানাঘুষাতেই শোনা গিয়েছিল দু'চারদিন ধ'রে। কুমিল্লায় ছিল মণিময়। কালবিলম্ব না ক'রে নোয়াখালি ছুটে গিয়েছিল। কিছু বেশি দেরিতে।

পৈতৃক ভিটেয় তখনো আগুন জ্বলছে। বড়ো টিনের ঘরখানার অবশিষ্ট কিছু নেই। দগ্ধ অঙ্গারস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেল দোমড়ানো,

বাঁকানো তোরঙ্গ কয়েকটা, গোটা কয়েক ঝলসানো টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, আর প্রায়দগ্ধ একটি নারীকঙ্কাল।

নিরুপমা পুড়েই মরেছিল। লালসায় আত্মাহুতি দেয়নি। যাবার সময় অক্ষম স্বামীকে ধিক্কার দিয়ে গেছে কিনা কোন দিন জানা যাবে না।

বিশেষ কিছু করবার ছিল না। সকলের অলক্ষ্যে গ্রাম থেকে পালিয়ে এলো মণিময়। তখন অবস্থা শান্ত হয়ে আসছে। বন্দুক কাঁধে এসেছে সিপাই—তাদের চরণভরে ধরণী টলমল করছে। এসেছে স্বেচ্ছাসেবী, দলে দলে। গ্রেপ্তার চলছে; সরকার বাহাদুর অভিযোগ শুনছেন সকলের।

কিন্তু সেই অভিযোগকারীর দলে মণিময় ছিল না। তার সমস্ত অভিযোগের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কুমিল্লায় ফিরে এসে নিলে দীর্ঘ ছুটি; চ'লে এলো কলকাতায়। পূর্ববঙ্গে আর না। ফের জয়েন করল কুষ্টিয়ায়। মন টিকলো না। বদলি হ'ল বহরমপুরে। অতঃপর ফের কলকাতায়।

কিন্তু এ কী হ'ল! যার মৃত্যু ঘটেছে ব'লে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিল এতদিন; যাকে অগ্নিসাক্ষী ক'রে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বাঁচাতে পারেনি ব'লে এ ক'মাস ধ'রে অহরহ নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে, সেই নিরুপমার সংবাদ নিয়ে এসেছেন আজকের এই ভদ্রলোক। অবিকল প্রতিকৃতি আর হস্তাক্ষর, নির্ভুল প্রমাণ নিয়ে এসেছে।

কোথায় ছিল এ ক'মাস নিরুপমা?

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব চাইবার সময় কি এই। কোথায় আছে, সেটাই আসল।

আছে কলকাতা শহরেই। বৌবাজারের এক গলিতে। অবলাবন্ধু আশ্রম, নাম শুনেছেন? আমি তারই সেক্রেটারি। মা লক্ষ্মী আমাদের ওখানে আছেন প্রায় হপ্তাখানেক হ'ল। আসবেন?

আসবে কি, মণিময় তৈরী হয়েই ছিল। কোনক্রমে পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়ে বললে, চলুন।

বৌবাজারের সেই আশ্রমে আবার দেখা হ'ল নিরুপমার সঙ্গে। প্রায়ান্ধকার ঘরে জানালার পাশে একখানি টুলে ব'সে সূর্যাস্ত দেখছে, না, মণিময়ের পদধ্বনির প্রতীক্ষা করছে, বলা শক্ত। ভদ্রলোক মণিময়কে যে-ঘরখানায় বসতে ব'লে গেলেন, দরজার বাইরে কাঠের ফলকে তার পরিচয় লেখা আছে "ভিজিটর্স রুম"। দু'মিনিট অপেক্ষা ক'রেই মণিময় অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। ঘরের এককোণে রাখা আলমারীর বইগুলোও ইতিমধ্যে একবার উঠে সে দেখে এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দের খানতিনেক বই, সরল সূচীশিল্প, রন্ধনপ্রণালী, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, এই হ'ল অবলাবন্ধু আশ্রমের লাইব্রেরি।

ভেজানো দরজা ঠেলার শব্দে চকিত হয়ে মণিময় পিছনে তাকাল; নিরুপমা ঢুকছে। নিরুপমাই তো। পরণে একটা ছিঁড়ে আসা শাড়ী; হাত দু'টি নিরাভরণ; চুলে কটা রং ধরেছে। চোখ দু'টির কোল ঘিরে কালিমা। দুলে উঠল মণিময়, উত্তেজনা বোধ করল। নিরুপমা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, আর এগোয়নি। চোখ দু'টি আনত, থরথর করে কাঁপছে। নববধূ যেন প্রথম এসেছে বাসরঘরে। সঙ্কোচের জিঞ্জীরে পা দু'টি জড়িয়ে গেছে। এ অভিজ্ঞতা তো মণিময়ের নতুন নয়। বিয়ের পর প্রথম ক' রাত্রিই এ-রকম ঘটেছে। নিরুপমা দরজা পেরিয়ে আর শয্যা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, উঠে গিয়ে মণিময় তাকে টেনে এনেছে। পরম স্নেহে, অশেষ কোমলতায়, উন্মীলিত করেছে এক একটি সরমের দল।

সেই বাসরই কি আবার এলো আজ, এই বিড়ম্বিত অপরাহ্ণে, চার নম্বর বৌবাজারের গলিতে, অবলাবন্ধু আশ্রমে ?

উঠে গিয়ে মণিময় ডাকলো, এসো নিরুপমা।

নিরুপমা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে; সমস্ত শরীরটা থেকে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। আজকের এই নববাসর কান্নাতেই অভিষিক্ত হবে বুঝি। প্রথম বাসরে চুল খুলে দিয়ে মণিময়ের পা দুটি মুছিয়ে দিয়েছিল নিরুপমা।

প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। সমস্ত বাঙ্ময়তা আজকের এই মূক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই ছ'মাসের ইতিহাস লেখা আছে নিরুপমার রুক্ষ কেশপাশে, নিরলঙ্কার হাত দু'খানিতে, দ্যুতিহীন চোখে মলিন বসনে। অবিশ্রাম বর্ষণের মত নিরুপমার এই কান্না, ওর ওপর দিয়ে কী অমানুষিক অত্যাচার হ'য়ে গেছে তার সাক্ষী।

একটু পরে বাইরে থেকে হাঁক দিলেন কৃপাকিঙ্কর চক্রবর্তী, সকালের সেই ভদ্রলোক, ক্লাবের সেক্রেটারি।

—ভেতরে আসতে পারি? জিজ্ঞাসা ক'রে অনুমতির অপেক্ষা রাখলেন না, নিজেই ঢুকে পড়লেন।—আপিস-ঘরে একটু আসুন মণিময়বাবু, মামলাটা সমন্ধে আপনার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে।

মামলা? এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেল বুঝি মণিময়।—কিসের মামলা?

কৃপাকিঙ্কর একবার নিরুপমার, একবার মণিময়ের দিকে তাকালেন। —মা লক্ষ্মী কিছুই বলেননি বুঝি আপনাকে? আসুন, সব বলছি।

আপিস-ঘরে টেবিল-ল্যাম্পের নিচে ব'সে সব শুনল মণিময়। নিরুপমাকে ফিরে পেয়েছে, এতক্ষণ এই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য অনুভূতিই ছিল। এর যে রূঢ় বাস্তব দিক একটা আছে, সে খেয়াল হয় নি।

যে রাত্রে ওরা গ্রামে আগুন দেয়, সে রাত্রিতেই নিরুপমা নৌকোয় ক'রে চালান হয়ে যায়। তিনরাত্রি নৌকোয় ছিল। বিচিত্র সব মানুষ ছিল সহযাত্রী। নিষ্ঠুর তাদের মুখের পেশী, চোখে বিকৃত ক্ষুধা। পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা প'ড়ে থাকতো নিরুপমা, আর প্রহরে প্রহরে লালসা-পশুর আহার যোগাতো——একের পর এক। মনের অনুভূতি তো কবেই ম'রে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে শরীরের অনুভূতিও রইলো না। কেবল দিনরাত্রি সমস্ত প্রত্যঙ্গে একটা অসহ্য যন্ত্রণা, যা থেকে একমাত্র মুক্তি ছিল মাঝে মাঝে সংজ্ঞালুপ্তিতে।

নৌকো থেকে গেল এক গঞ্জে। কাহিনী সেখানেও এক। সেখানেও বুঝি এলো মিলিটারি! নিরুপমাকে নিয়ে ওরা আবার পাড়ি দিল। এবার এলো এক দ্বীপে। সে-দ্বীপের নাম নিরুপমা জানে না। কেবল ছোট্ট জানালার ফাঁকে দেখেছে নীল আকাশের বিস্তার; নিরবশেষ জলকল্লোল। দীর্ঘকায় নারকেল গাছগুলো ছিল ওর ওপর সেই চরম অত্যাচারের সাক্ষী।

সেখান থেকে কিছুদিন পরে আবার ওকে চালান ক'রে দিলে। এবার এলো বড়ো একটা রেল জংসনে, দু'তিনটে গাড়ি বদলের পর। ওর মাথা ঢাকা থাকতো বোরখায়, মুখে চাপা থাকত রুমাল। সেইখানে, সেই রেল জংসনে ধর্মান্তরিতা হ'য়ে নিরুপমার বিয়ে হ'ল রেলওয়ে ওয়ার্কসপের এক মিস্ত্রির সঙ্গে।

—বিয়ে হ'ল? মাথা নীচু ক'রে এতক্ষণ মণিময় সব শুনছিল; এইবার চীৎকার ক'রে উঠলো—বিয়ে হ'ল!

চক্রবর্তী বললেন, আমরা তা স্বীকার করব না, কিন্তু ওরা তাই বলে। বিয়ে হ'ল কিন্তু নিরুপমা পোষ মানল না। আরো অনেক তালাক, অনেক নিকের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নিরুপমা কলকাতা পৌঁছেছে গেল মাসে। এখানে ওকে এনে রেখেছিল বস্তিতে। দিন

পনেরো আগে অস্ত্রের সন্ধানে হানা দিয়ে পুলিশ অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছে নিরুপমাকে। সেই থেকে ও আমাদের এখানেই আছে।

মণিময়কে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে কৃপাকিঙ্কর বললেন, মায়ের যারা অসম্মান করেছে, পুলিশ তাদের ক'জনকে ধরেছে। মামলা শুরু হবে পরশু থেকে। এর মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, এটা বিধাতার আশীর্বাদ। আমাদের কেস্ এবারে খুব স্ট্রং হবে।

এর পরে পনেরো দিন কী ভাবে কেটে গেল মণিময় টেরই পেলে না। থানা থেকে উকিলের বাড়ি, উকিলের বাড়ি থেকে আশ্রম—সেখান থেকে আদালত, ঘুর্ণীর মতো ঘুরেছে শুধু। একমাত্র চিন্তা নিরুপমাকে উদ্ধার করতে হবে। অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করবে। আইনমানা সভ্য মানুষ সে, আইনের বাঁকা পথেই প্রতিশোধ নেবে।

রায়ে অবশ্য অপ্রত্যাশিত কিছুই ছিল না। আসামীদের সাজা হ'ল পাঁচ থেকে দশ বছর। সন্দেহের অবকাশে দু'একটা চুনোপুঁটি ছাড়াও পেল।

মণিময় একটু আগেই বেরিয়ে আদালত-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিল। কৃপাকিঙ্করের সঙ্গে ধীর পায়ে নিরুপমা সেখানে এলো। জয়ের উল্লাসে প্রৌঢ় কৃপাকিঙ্করের চোখ দু'টি উজ্জল হ'য়ে উঠেছে; কিন্তু, মণিময় আর নিরুপমার চোখে দ্যুতি কই।

মণিময় বললে, আসুন, গাড়ি ডাকি।

গাড়ি এলো। ধীর, কাঁপা-কাঁপা গলায় নিরুপমা বললে, আমি কোথায় যাবো!

মণিময় এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইল। তারপর আস্তে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, কেন, আমার বাসায়। কিন্তু আবাহন তো কুণ্ঠাহীন হল না।

নিরুপমা ফিরে এলো বটে, কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। এই ক'মাসের অভিজ্ঞতা ওকে পাথর করেছে। চক্রবর্তীমশাই প্রথম দিন

দু'চার কথার পর বিদায় নিয়েছিলেন। নিরুপমা সেই যে চেয়ারে ব'সে জানলার বাইরে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তো আছেই। মণিময় কাছেই রয়েছে, তার উপস্থিতি অনুভব করছে নিরুপমা, কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। মণিময়ও কথা বলতে পারল না। "তুমি একটু বোসো" ব'লে বাইরে বেরিয়ে যেতে নিরুপমা একটু স্বস্তি পেল।

গত ছ'মাস ধ'রে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে নিরুপমার, এ যেন তার চেয়েও দুর্বিষহ। মণিময়কে বুঝি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এ কি সম্ভব। মণিময় ফের তাকে নিয়ে সংসার রচনা করবে. অনেকের উচ্ছিষ্ট একটা মেয়েকে নিয়ে ? কর্তব্যবোধে একই ছাতের নিচে ঠাঁই দিয়েছে বটে কিন্তু সমান ক'রে নিতে পেরেছে কি। ' ঘটা ক'রে উদ্ধার করেছিল বটে, কিন্তু সেতো নেহাৎ করুণাপরবশ হয়ে। আজ যে সদয় ব্যবহার করছে, তার মধ্যেও কোথায় যেন করুণার ছিটে রয়েছে।

বাসায় ফিরে মণিময় দেখল নিরুপমা তখনো ব'সে। বাইরে থেকেই খাবার এনেছিল, নিজে এসেছিল খেয়ে। ঠোঙাটা নিরুপমার হাতে তুলে দিল। পাশের ঘরে গিয়ে নিরুপমা খাচ্ছে, সেই অবসরে বিছানাটা নিজেই পেতে নিল মণিময়। শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করল নিরুপমার। কিন্তু নিরুপমা এলো না। প্রতীক্ষার শেষে নিজে যখন উঠে গেল, নিরুপমা তখন পাশের ঘরেই মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছে। মণিময় সাড়া দিতে পারতো, ডেকে তুলতে পারতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকা হ'ল না। নিঃশব্দ পায়ে মণিময় ওর বিছানায় ফিরে এলো।

পরদিন সকালে উঠে দেখল, নিরুপমা উঠে পড়েছে। স্নানও সেরে ফেলেছে এরি মধ্যে। মণিময় জিজ্ঞাসা করল, চা কই আমার ?

নিরুপমার মুখ শুকিয়ে গেল।—চা করিনি তো। একটু থেমে আস্তে আস্তে, সসঙ্কোচে ফের জিজ্ঞাসা করলে, আমি চা করব ?

অর্থ এই, নিরুপমার হাতে তৈরী চা মণিময় খাবে কিনা। মণিময় অতোসতো বুঝলে না। বললে, থাক, বাইরে থেকেই খেয়ে আসছি।

চা খেয়ে ফিরলো মণিময়, সঙ্গে এক রাঁধুনী বামুন নিয়ে। নিরুপমাকে বললে, রান্নার ঝক্কি তোমাকে আর পোহাতে হবে না। এই সব করবে এখন থেকে।

নিরুপমা ভাবলে, আমি অশুচি ব'লেই উনি আমার হাতে খাওয়াটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন।

আরো স্তব্ধ হয়ে গেল। কৌতুকে, স্বাচ্ছন্দ্যে, উচ্ছ্বসিত ছিল যে, সে একেবারে মূক নির্বিকার হয়ে যাচ্ছে। শামুকের মতো গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। নিতান্ত যেটুকু স্থান অধিকার না করলে নয়, এ বাসায় কেবলমাত্র সেইটুকুই নিয়ে আছে, একচুলও কম বেশি নয়।

মণিময়ও কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। সমস্ত উৎসাহ উজাড় ক'রে যা'কে পশু-কবল থেকে ছিনিয়ে আনল সেকি এই ? এই অহল্যাকে পুনরুজ্জীবিত করবে, সে উৎসাহ কই।

বলে, সিনেমায় যাবে, নিরুপমা ? খুব ভালো ছবি, চলো।

নিরুপমা, আশ্চর্য, সম্মত হয়ে গেল। বললে, আচ্ছা। মণিময় খুশি হ'ল। এ একটা নতুন রকমের পরীক্ষা। হয়ত এই পথেই নিরুপমা সহজ হবে, স্বাভাবিক হবে, ওর কাছে আসবে। পাঁচ মিনিট গেল, মণিময় ইতিমধ্যে জামা প'রে চুল বুরুশ ক'রে তৈরি হয়ে নিয়েছে। নিরুপমা তখনো যাত্রার কোন উদ্যোগ করছে না, দেখে বিস্মিত হয়ে বললে, তুমি তৈরী হয়ে নাও ?

—আমি তো তৈরিই আছি। নীচু গলায় বললে নিরুপমা।

—সে কি, এই ছেঁড়া শাড়িতে ?

—আমার আর শাড়ি নেই।

মণিময় লজ্জিত হ'ল। বাস্তবিক, তারই খেয়াল হয়নি। কতদূর চ'লে গেছে তারা পরস্পর থেকে,—একে অপরের অত্যন্ত মৌলিক প্রয়োজন, সুখ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাতেও ভুলে গেছে।

একই ছাতের নীচে ওদের দু'জনের জীবনের স্রোত একই ভাবে বইতে লাগল দুই খাতে, দুস্তর চরের ব্যবধান রেখে। মাঝে মাঝে কাছাকাছি এলো বটে, কিন্তু এক হ'ল না।

ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠতে লাগল মণিময়। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যেন জেনেছে একটা মৃতদেহের সঙ্গে এক শয্যায় সারারাত শুয়ে ছিল। মৃতদেহ? মৃত, না হোক, জীবিত শরীরেই একটা মৃত মন বহন করছে নিরুপমা, তাতে ভুল নেই। প্রথম প্রথম ক'দিন সকাল সকাল ফিরতো অফিস থেকে, ক্রমশ দেরি হ'তে লাগল।

নিরুপমা কোন কৈফিয়ৎ চায়নি, তবু প্রথম দিন দেরি ক'রে ফিরে মণিময় অযাচিত কৈফিয়ৎ দিলে,—আপিসে কাজ ছিল। দ্বিতীয় দিন বললে, "ক্লাবে গিয়েছিলুম।"

নিরুপমা হাঁ-না ভালো-মন্দ কিছুই বললে না। মণিময়েরও সাহস বেড়ে যেতে লাগল। নিরুপমার সান্নিধ্যে ম্রিয়মান হয়ে-আসা-প্রাণ অকস্মাৎ যেন নতুন একটা নেশা আবিষ্কার করেছে। ক্লাবে অনেক মানুষের সংসর্গে চিত্ত সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে: গান বাজনা, অভিনয়, জুয়া। ক্রমশ মেতে উঠলো মণিময়। বন্ধুরা বোঝালে, এই হ'ল আসল জীবন। এতদিন জীবন ভেবে যে পাত্রে চুমুক দিয়েছে, আসলে সেটা বার্লিজল মাত্র। শনিবারে রেস, রবিবারে জুয়া, সন্ধ্যায় থিয়েটার, কিম্বা কোন আসরে পানস্নিগ্ধ মেজাজ নিয়ে নৃত্যসম্বলিত গানের তারিফ করা—জীবনের যে এত উগ্র রঙিন দিক্ আছে, আগে মণিময়

জানতো না। নিরুপমা আরো দূরে স'রে যাচ্ছে, যাক। নিরুপমাকে আর প্রয়োজন নেই।

বাড়ি ফেরবার সময়ের কাঁটা ক্রমশই পিছিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু একদিন কিছু মাত্রাধিক্য ঘটে গেল। রেস থেক ফেরবার পরও যে ক'টি মুদ্রা অবশিষ্ট ছিল, সে ক'টিও পানীয়ের দোকানে এক ঘণ্টায় কর্পূরের মতো উবে গেছে। নৈশ আসর যখন ভাঙল, তখন মণিময়ের চেতনা ব'লে কিছু নেই। কখন কারা যে রিক্সায় তুলে বাসার কাছে নাবিয়ে দিয়েছে, হুঁস নেই। অনেক কষ্টে বাসার দরজা পর্যন্ত এসে এলিয়ে পড়ল।

নিরুপমা জেগেই ছিল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখল, মণিময় কর্দমাক্ত নর্দমায় শয়িত; পরিধেয় ছিন্নভিন্ন। জামায় বোতাম নেই, পকেটে নেই কলম; হাতঘড়িটাও অন্তর্হিত। কপালে আঘাতের চিহ্ন—রক্তে কাদায় সেটা বীভৎস।

এক মুহূর্ত কী ভাবল নিরুপমা; তারপর কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিল শক্ত ক'রে। মণিময়কে ঈষৎ টেনে তুলতেই সে রক্তিম চোখ দু'টি তুলে জড়িতস্বরে কী যেন বলতে চেষ্টা করল, একটু পরেই দেখা গেল নিরুপমার কাপডটা বমিতে ভেসে যাচ্ছে।

নিরুপমার ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু টেনে আনল মণিময়কে বিছানায়। কাপড় বদলে দিলে, মুছিয়ে দিলে হাত, পা, মুখ চোখ, মাথা। হাওয়া করতে লাগল ধীরে ধীরে।

মণিময়ের ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল বেলা। দেখল নিরুপমা শিয়রে ব'সে আছে। তৎক্ষণাৎ মুখটা বালিশে ঢেকে ফেললে। নিরুপমার দিকে তাকানোর সাহসটুকুও তার নেই।

চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিরুপমা স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে এখন? গরম দুধ এনে দেবো একটু?

মাথাটা সামান্য একটু আন্দোলিত ক'রে মণিময় হাঁ-কি-না, কী বললে বোঝা গেল না। নিরুপমা উঠে গিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এলো। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে মণিময় অবাক হ'য়ে গেল। নিজে হাতে মণিময়কে খাবার তুলে দেওয়া এ বাসায় এসে নিরুপমার এই প্রথম। নিঃশেষে চুমুক দিয়ে খেয়ে মণিময় আবার শুয়ে পড়ল।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করল, আর কিছু খাবে এখন?

নিঃসঙ্কোচ, সপ্রতিভ মায়ের মতো মমতা-কোমল কণ্ঠ। মণিময় করল কি, বালিশশুদ্ধ মাথাটা নিরুপমার কোলে তুলে দিয়ে আঁকড়ে ধরলো নিরুপমাকে। বললে,—কিছু না। তুমি বোসো খালি খানিকক্ষণ।

নিরুপমা সরেও গেল না, শক্তও হয়ে উঠল না। অনেকক্ষণ ধ'রে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল মণিময়ের, যে তার পাতালে আজ নেমে এসেছে।

পুরনো রোগ

সারা রাত বাইরে অশব্দ আকাশের হিমকান্না, আর ভিতরে প্রিয়লাল তরফদারের খুকখুক কাশি—সেবারকার রাঁচিভ্রমণের স্মৃতি এইটুকু মোটে আছে। আরো একটু আছে। ডাক্তারের মুখে শোনা তরফদারের গল্প। সেই গল্পই লিখছি।

সেবার যেমন শীত, তেমনি ভীড়। কাল ক্রিশ্‌মাস, টুরিস্টদের তখন পায়ের তলা সুরসুর। হোটেলওয়ালাদের পৌষমাস, শুধু একটা অর্থে নয়। অভিজ্ঞতা যা হ'ল, করুণ রকমের। হোটেলে হোটেলে বন্ধ দ্বার।

এক হোটেলওয়ালা বললে, ঘর খালি নেই, তবে দোতালার বারান্দায় একটু খালি জায়গা আছে। বলেন তো ওখানে দু'টো তক্তপোশ দিই। সভয়ে ডাক্তারকে বললুম, রক্ষে করুন, এই শীতে বাহির কৈনু ঘর করতে ভরসা নেই। আপনি ডাক্তার মানুষ, নিউমোনিয়া হয়ত রেহাই দেবে, কিন্তু আমার ছাড়পত্র কই।

শেষ পর্যন্ত জুটল হোটেল। গলির মধ্যে একতলা বাড়ি। দরজার মাথায় লটকানো সাইনবোর্ডে উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং আরামদায়ক বাসস্থানের আশ্বাস। এখানেও রুম খালি ছিলনা; তবে একটা থ্রী-সীটেড ঘরের দুটো সীটই পাওয়া গেল। খালি সীটটার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললে, আলাদা ঘর হ'লেই ভালো হত। যাক, হোটেল যখন সয়েছে, তখন রুমমেটও সহ্য হবে। সবকিছুই রুচিসই মেলেনা।

হাই তুলে ডাক্তারের কথায় সায় দিলুম। ন'টা, দশটা, এগারোটা। শীতের রাত, পাড়া ঝিমিয়ে পড়ল। আমাদের রুমমেটের তখনো দেখা নেই। কৌতূহল না থাক, উৎকণ্ঠা ছিল। একসঙ্গে রাত্রিবাস করতে হবে, অন্তত চেহারাটা কেমন, দেখে রাখা ভালো। অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার আলো নিভিয়ে দিলে।—আসুন ঘুমোনো যাক। জাগরণে বিভাবরী পুইয়ে লাভ কী।

জাগালেন তিনি নিজেই এসে।

গভীর রাতে কী একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিরক্তিতে চোখ মেলে দেখি হাতে একটা ল্যাম্প নিয়ে প্রায় মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একটা লোক। প্রথমটা ভয় পেলুম। ভাবলুম চোর। কিন্তু চোর কিছু আলো হাতে চুরি করতে আসবেনা ভেবে ডাক্তার বাবুকে আর তুললুম না।

লোকটা ল্যাম্প্‌টা তুলে রাখলে জানালার ওপর। বললে, কিছু মনে করবেন না। আমি এই ঘরেই থাকি। শ্রীপ্রিয়লাল তরফদার। নতুন লোক কে এল দেখছিলাম।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল। পরিচয় করার স্পৃহামাত্র ছিলনা। শুভদৃষ্টির সময় আর রীতি কি এই। কিন্তু প্রিয়লাল অতো সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। ছোটনাগপুরের জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করেন। সেই কাঠ চালান যায় নানা জায়গায়; কলকাতা? হ্যাঁ, কলকাতাতেও। বেশির ভাগ এদিক ওদিকেই কাটে, খালি রাঁচিতে স্থায়ী আস্তানা রেখেছেন একটা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে জিরিয়ে নেন।

—আলোটা নিবিয়ে দিন। তন্দ্রাতুর স্বরে বললুম।

—নেবাই, নেবাই, প্রিয়লাল অপ্রতিভ হয়ে বললেন, অসুবিধে হচ্ছে নাকি আপনার। ঘুমোন্‌ তবে।

প্রিয়লাল তো ঘুমোনোর অনুমতি দিয়ে নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমার ঘুম এলো না সহজে। একে নতুন জায়গা, তাতে কনকনে শীত ; সর্বোপরি শ্রীপ্রিয়লাল তরফদার। থেকে থেকে ক্রমাগত কাশছেন। প্রথমে খুক খুক, ক্রমশ বেগ বাড়ে, তারপর একটানা শ্বাসকষ্ট চলে।

প্রিয়লাল বললেন, আপনার অসুবিধে হচ্ছে নাকি। একটু হাঁপানি আছে আমার। অনেক কালের ব্যামো। মাঝে মাঝে এঘরে ছাগল এনে রাখি। ধন্বন্তরি ওষুধ। তা আপনারা যখন এসেছেন, এবার আর আনব না।

কথাটায় আশ্বস্ত হ'লাম বটে, কিন্তু ঘুম এলো না।

পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখলুম, ডাক্তার ইতিমধ্যেই উঠেছে। দাড়ি কামিয়ে স্নানও ওর সারা। তিনটি চুরুট ইতিমধ্যেই ভস্মীভূত। প্রিয়লাল তরফদারকে দেখা গেল না।

ডাক্তারকে গতরাত্রের ঘটনার কথা বলতেই সে বললে, আমি আজ সকালে ওকে দেখেছি। আলাপ পরিচয় হয়নি, নমস্কার বিনিময় মাত্র হয়েছে। আমি মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই লোকটা বেরিয়ে গেছে।

একটু থেমে আবার বললে, মনে হচ্ছে লোকটাকে কোথায় দেখেছি।

বললুম, ও রকম মনে হয়। রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্—

ডাক্তার বললে, আমি প্রাকটিক্যাল মানুষ। রুগীর নাড়ী টিপে, দরকার হলে ছিঁড়ে কেটে খাই। জননান্তরাণি সৌহৃদানির ধার বিশেষ ধারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রিয়লাল তরফদারকে আমি চিনি, অন্তত এককালে চিনতাম। আজ সকালে আমার দিকে ও বারবার ফিরে চাইছিল। মনে হয়, ও-ও চিনি-চিনি করছে, এখনো পারে নি।

দুপুরবেলা ফের দেখা হ'ল। ডাক্তার প্রিয়লালকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করল, প্রিয়লাল জবাবও দিলে, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে সে রকম

আগ্রহ ফুটল না। কাল সেধে আলাপ করতে এসেছিল, আজ পাশ কাটাতে চাইছে।

সন্ধ্যাবেলা ম্যানেজারের মুখে শুনলুম, প্রিয়লাল হোটেল ছেড়ে দিয়েছে। জরুরি তার এসেছে রামগড় না হাজারিবাগ থেকে। খবরটা ডাক্তারও শুনল। কিছু বলল না।

পরদিন মোরাবাদী পাহাড়ে গেলুম। উঠতে কিছু শ্রম হয়েছিল। বিশেষ, আমরা বাঙালী, সমতলের লোক। ডাক্তার একটা চুরুট ধরালো। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল, একটা কথাও বলে নি।

—এ একটা দারুণ অস্বস্তি, ডাক্তার হঠাৎ শুরু করল, চেনা লোককে চিনতে না পারা। আজ দু'দিন দু'রাত্রি কেবলি ভেবেছি লোকটাকে কোথায় দেখেছি। সেই মুখ, সেই ভঙ্গি, তবু ধরতে পারি নি। কানের কাছে সারাক্ষণ একটা মাছি ভন্ ভন্ করলেও এত অস্বস্তি হয় না।

কিন্তু এইবারে, পা দুটো সামনের দিকে পরম আলস্যে প্রসারিত করে ডাক্তার বললে, এইবারে আমার কোন সন্দেহ নেই। শ্রীপ্রিয়লাল তরফদারকে আমি চিনেছি। ওর আসল নাম বৃন্দাবন মাইতি কিংবা সেইটেই হয়ত ছিল নকল নাম, এইটেই আসল।

চুরুটটায় ফের সযত্নে অগ্নিসংযোগ করে ডাক্তার বলল, আমাকে দেখে লোকটা হোটেল-ছাড়া হয়ে পালালো কেন, বুঝতে পারছি না। আমি পুলিশ নই, দুশমনও না। খুনী আসামী নয় তো, ওর অতীতের সামান্য দু'একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা জানি, এতেই এত লজ্জা?

চোখ বুঁজে চুরুট টানার আয়েসী ধরণ দেখেই বুঝেছিলাম, গল্প আসন্ন। এত দীর্ঘ ভূমিকার পর বাধাও দিতে পারলুম না। ডাক্তার শুরু করলে: তখন সবে প্র্যাকটিশের আদিপর্ব। শতমারী সহস্রমারী দূরে থাক, একটি রোগীরও মুখাগ্নির বন্দোবস্ত করতে পারি নি। দু'একটা

কেস পাই বটে, কিন্তু জানেন তো, ছিঁচকে চুরির মত ছুটকো রুগী দেখে লাভ নেই। প্রেসক্রপসনের কাগজ কালির দাম ওঠে না।

পরের ডিস্পেনসারীতে বসি, আর অদূর ভবিষ্যতে ভিজিটের টাকাভর্তি পকেট নিয়ে ল্যাণ্ডো চাপার স্বপ্ন দেখি, এমন সময় বৃন্দাবন ওরফে প্রিয়লাল তরফদারের সঙ্গে আলাপ। সেদিন ডাক্তারখানায় একলাই ছিলাম, রুগী নেই, হাই তুলছি। চিৎপুরের মেয়েরা তবু রাস্তায় দাঁড়াতে পায়, কিন্তু পসারহীন ডাক্তারদের কপালে শুধু চোরের মার কান্না। প্রফেসনের কৌলীন্য এমনি। প্রিয়লালকে দেখে হকচকিয়ে গেলুম। রূপের কথা তুলব না, রুচিতে বাধে; আমি নিজেও সুরূপ নই, কিন্তু এমন হতশ্রী চেহারা আগে দেখিনি। রোগা জিরজিরে, মনে হ'ল বৃথাই এতদিন কেতাব পড়ে মড়া কাটাকুটি করে মানবদেহের শিরা-অস্থি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছি। শরীরে ক'খানা হাড় আছে, আর শিরা-উপশিরার রহস্য জানতে হলে প্রিয়লাল তরফদারকে এক নজর দেখাই যথেষ্ট। লোকটা চোরের মতো ঢুকে একটা আসন নিয়ে বসেছিল। এদিক ওদিক চাইছিল। পরীক্ষা করবার প্রয়োজনও হ'ল না। ওর শরীরের যেটুকু অনাবৃত সেটুকু লাল লাল দাগে ভর্তি, লোকে যাকে বলে পারা ওঠা। এক পলক দেখেই বুঝে নিলুম কী অসুখ। কয়েকটা প্রশ্ন করলুম। প্রথমে জবাব দিতে চায় না, ঢোঁক গেলে, মাথা চুলকোয়, এমনভাবে ব্লাশ করে ও যেন নতুন বৌ, আমি বয়স্থা ননদ, ফুলশয্যার রাতে কী হয়েছিল জানতে চাইছি। ধমক দিতে সব স্বীকার করল। দু'খানা বাড়ির পরে মোড়ে মিত্তির বাড়ি। সেখানে প্রিয়লাল বাজার সরকার কি গোমস্তা জাতীয় একটা কিছু। বাইরের ঘরে থাকে। রোজ সন্ধ্যায় সোজাপথে বাড়ি ফেরে না। আর রোজ ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরাও হয় না।

তখনকার দিনে এসব রোগের দ্রুত চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। যা জানি একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলুম। মাঝে মাঝে এসে কেমন থাকে জানিয়ে যেতে বললুম। যাবার সময় প্রিয়লাল আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরল। যেমন করে পারি ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে। নইলে ওর আত্মহত্যা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। আমার যথাসাধ্য করব বলে ওকে সেদিনের মতো বিদায় করলুম।

তারপর থেকে প্রিয়লাল মাঝে মাঝে ডিসপেনসারিতে আসতে লাগল। কোনদিন দেখি ঘাগুলোতে টান ধরেছে। কোনদিন একটু একটু দগ্‌দগে। জ্ঞানমতো চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলুম, আর অধ্যবসায়ের বখশিশ আছেই। একদিন প্রিয়লাল হাসিমুখে এসে জানালো, ঘা শুকিয়ে এসেছে। আড়ালে নিয়ে ওকে পরীক্ষা করলুম। মনে হ'ল তাই বটে। ওর সেরে উঠতে বিশেষ বাকি নেই। এতদিন ফী কিছু নিইনি। এবারে প্রিয়লাল কোন আপত্তি শুনল না, পঞ্চাশটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। আমি ওকে বারবার সাবধান করে দিলুম, রাহু মুক্তির সুযোগ নিয়ে যেন ফের পুরনো অভ্যাসে ফিরে না যায়। প্রিয়লাল সেরে গেল বটে, কিন্তু দাগ গেল না। কাল দুপুরে ও খালি গায়ে তেল মাখছিল, সেই মুহূর্তে ওকে আমি চিনতে পারি।

সেরে যাবার পরও ও নিয়মিত ডাক্তারখানায় আসত। এ শ্রেণীর লোকের ঘন ঘন যাতায়াত আমি পছন্দ করতুম না, তবু আসত। মানা করবারও উপায় ছিল না, ডাক্তারি করি বলে হৃদয়টাকে অপ্রয়োজনীয় বলে ছেঁটেছি, কিন্তু ভদ্রতার একটা অলিখিত কোড্ তো মানি। তা ছাড়া লোকটা উপকারও করত। কিছু কিছু কেস জোগাড করে দিতো, এমন কি শেষ পর্যন্ত ওর সুপারিশেই আমি পাড়ার সেরা বনেদী ঘর মিত্তির বাড়ির ছাড়পত্রও পেয়ে

গেলুম। আমার মতো হাতে খড়ি দেওয়া প্র্যাকটিশনারের পক্ষে একটু অভাবনীয় বৈকি। এতদিন ও-পাড়ায় আছি, মিত্তির বাড়ির জানালা কখনো খুলতে দেখিনি, এমন বিষম পর্দা। দেউড়ি থেকে তাকালে মনে হ'ত শুধু অন্ধকার। মোটা মোটা থাম, খিলানের পর খিলান। শ্বেত পাথরের গোটা পঞ্চাশেক সিঁড়ি ডিঙিয়ে তবে বুড়ো মিত্তিরের শোবার ঘর। প্রথমবার ঢোকার সময়ের বুক ঢিপ ঢিপ এখনো মনে আছে।

বুড়ো মিত্তিরের অসুখটা ব্লাডপ্রেশার; বাড়ে, কমে। ইতিপূর্বে এ্যালোপ্যাথি, হোমীওপ্যাথি, হেকিমি, কবরেজি, য়ুনানী, অবধূত সব হ'য়ে গেছে। চিকিৎসাতে আর ওঁর বিশ্বাস নেই, তবু প্রিয়লালের পরামর্শে আমাকে দেখাতে রাজি হয়েছেন। শেষ চেষ্টা আর কী। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রিয়লাল বলেছিল, ভিজিট যেন আমি ষোল টাকা চাই। আমি বললুম, ষোল কেন? আমি তো মোটে ছ'—

আমাকে কথাটা শেষ করতে দিল না প্রিয়লাল। বলল, ষোল টাকার কম ভিজিটের কোন ডাক্তারকে মিত্তিরমশাই অঙ্গস্পর্শ করতে দেন না।

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই ডাক পড়তে লাগল। প্রথম দিকে মিত্তির বাড়ি সম্বন্ধে মনে যে ভয়মিশ্রিত বিস্ময় ছিল, সেটা আস্তে আস্তে কেটে গেল। ক্রমশ জানলুম, বাড়িটার আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা নেহাৎই কম। ঝি চাকর কর্মচারী বাদ দিলে মোট চারজন। কর্তা স্বয়ং, গিন্নী; বিধবা মেয়ে সীমা, যাকে আমি প্রথমে কুমারী বলে ভুল করেছিলাম; পুত্রবধূ ইন্দ্রাণী, প্রোষিতভর্তৃকা। মিত্তির কর্তার ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে গেছে বিলেতে, এ খবর প্রিয়লালের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। যাই হোক, ইন্দ্রাণীকে

বেশি দেখার সুযোগ আমার হয়নি, দু'একবার বাদে। সে কথা পরে বলছি।

সে তুলনায় সীমাকে বরং অনেক বেশি দেখেছি। ঢলঢলে কাঁচা মুখ, ঠোঁটের প্রান্তে একটু ম্রিয়মাণ হাসি। স্বল্পাভরণা, কিন্তু বৈধব্য বলতে আমাদের মনে যে একটা রুক্ষ কৃচ্ছ্র তার ছবি ভেসে ওঠে তার আভাসমাত্রও নেই। কপোলে, চিবুকে, গ্রীবায়, পায়ের পাতায়, হাত দুটির নিম্নার্ধে—বস্তুত দৃশ্য প্রত্যঙ্গমাত্রে—একটা কাঁচা-সোনা আভা; উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ। পোনেরয় বিয়ে হয়েছিল, ষোলয় বিধবা।

আমাকে মুগ্ধ করেছিল সীমার সপ্রতিভতা। বুড়ো কর্তাকে দেখতে গেলে ওর কাছেই সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি। গিন্নী তো আড়াল থেকে ফিস ফিস করে দু'একটা কথার জবাব দিয়েই খালাস; অনেক ডাকাডাকিতে হয়ত একগলা ঘোমটা নিয়ে সমুখে এসে দাঁড়াতেন। তাঁকে দিয়ে কোন কাজই হ'ত না। প্রথম ক'দিন খুবই অসুবিধে হয়েছিল। এমন সময় এ পরিবারের সব সংস্কারের পর্দা সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো সীমা, অকুণ্ঠিত, সহজ। ঠিক যা জানতে চাই, সেই জবাব পাই। রোগীর কী অস্বস্তি, ঘুম কতটুকু, রোগটা কখন বাড়ে, কমে; আহারে রুচি, সব ওর কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নিতুম।

প্রিয়লালের কাছেও শুনেছি, সেবা-শুশ্রূষা বেশির ভাগ সীমাই করে। রুগীর মাথা ধোয়ানো খাওয়ানো শোয়ানো, সব। গিন্নীর নিজেরই বাত, মাঝে মাঝে চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে যেতেন, তো স্বামীসেবা!

প্রিয়লালকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইন্দ্রাণী কিছু করেন না? বৌরাণী?

জিভ্ কেটে প্রিয়লাল বলেছে, আরে, ব্যস্। তা হলে আর কথা ছিল কী। বড়োলোকের মেয়ে। ওঁর বাবা বিয়ের সময় পণ দান-

সামগ্রী মিলিয়ে পঁচিশহাজার দিয়েছিলেন। তার ওপর খরচ দিয়ে জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছেন। মাটিতে বৌরাণীর কি পা পড়ে। পালঙ্ক থেকে একবার দু'বারের বেশি নামেন না। ঘটা করে পোষা বেড়ালটাকে দুধ খাওয়ানো ছাড়া আর তো কোন কাজ দেখিনে ওঁর।

আর? আরো একটু কাজ আছে বৈকি। ফি সপ্তাহে . দাদাবাবুকে এয়ারমেলে চিঠি লেখা।—খুব বনিবনা বুঝি, বৌরাণী আর দাদাবাবুর? কী করে নির্বোধের মতো এই প্রশ্নটা করতে পেরেছিলুম ভেবে অবাক লাগে।

প্রিয়লাল একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, বিয়ের পর দাদাবাবু এদেশে তো মোটে মাসখানেক ছিলেন। বাইরে থেকে আমরা মিলও দেখিনি, অমিলও না। তবে স্বামীগর্ব বৌরাণীর খুব। রোজ দাদাবাবুর ফোটো ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করেন—এটুকুও করেন নিজ হাতে। দাদাবাবুর পরীক্ষার সার্টিফিকেটগুলো বার করে দেখেন। আর গর্ব হবেই বা না কেন। দাদাবাবু এখানে সব পরীক্ষাতেই ফাস্ট. সোনার মেডেলই আছে তিন চারটে। আর রূপ? সে আপনি চোখে দেখলে বুঝতে পারতেন।

—রূপসী তো তোমাদের বৌরাণীও। কথাটা বলে ফেলে সঙ্কোচ বোধ করেছি, পরস্ত্রী সম্পর্কে খোলাখুলি উচ্ছ্বাস প্রকাশটা বোধহয় সঙ্গত হয়নি। প্রিয়লালের ভ্রূক্ষেপ নেই, ঘাড় নেড়ে সে তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েছে, আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিক থেকে রাজযোটক হয়েছে বল্‌তে হবে। দুটিকে পাশাপাশি দেখলে চোখ জুড়োয়।

কিন্তু মুশকিলও আছে। প্রিয়লাল তাও খুলে বলেছিল। বৌরাণীর এ বাড়ি পছন্দ হয়নি। যতো বড়োই হোক, এ বাড়ি পুরনো, জীর্ণ। প্রতি ঘরে ঢুকলে মনে হয় একশো বছরের পুরনো হাওয়া বন্দী হয়ে আছে, আর সেই হাওয়ায় ইঁদুর, চামচিকে আর আরশোলার

গন্ধ মেশামেশি। ওঁর বাপের বাড়ি বালিগঞ্জে, একপুরুষে বড়োমানুষ তো, ছোট ছোট ঘর, নীচু নীচু ছাদ, এসব থাম খিলানের কারবার আদৌ নেই, তবু সব ঘরই খটখটে আলোয় গা ধুয়ে ফুরফুরে হাওয়ার তোয়ালেতে গা শুকোয়। এ বাড়ির সব কিছু অপছন্দ বৌরাণীর। ইচ্ছে, দাদাবাবু ফিরে এলে ওকে নিয়ে বালিগঞ্জে আলাদা বাসা করবেন। যে ক'দিন আছেন, খালি খুঁৎ খুঁৎ করছেন। ঝি চাকরগুলোর ওপর খড়্গহস্ত। আমাদের কুকুর বেড়ালের মতো দেখেন বলব না, কেন না কুকুর বেড়াল ওঁর বড়ো আদরের।

ঝোঁকের মাথায় প্রিয়লাল সেদিন আরো অনেক আক্ষেপ করেছিল। বৌরাণী দিন দুই আগে ওকে এক বাক্স সাবান আনতে বলেন। সে সাবান অনেক ঘুরেও পাওয়া গেল না। সাবানের বাক্সটা ছুঁড়ে ফেললেন বৌরাণী, আরেকটু হ'লে প্রিয়লালের মুখে লাগত। 'অপদার্থ বেকুব!' গালাগাল স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল প্রিয়লাল, দেখেছিল বৌরাণীর চোখে ফুলঝুরি।

—আরো বলি শুনুন। আপনাকে এনে কর্তাকে দেখানোতেও বৌরাণীর মত ছিল না। বলেছিলেন, আমার বাবার বাড়িতে যে ডাক্তার বাঁধা, তার বিলিতি ডিগ্রী আছে গোটা তিনেক। এ ডাক্তারের তো মোটে দেশি একটা ডিগ্রী সম্বল, ও চিকিৎসার জানে কী।

শুনে সেদিন অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করেছিল। সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলতে হ'ল প্রিয়লালকে। জিজ্ঞাসা করলুম, তারপর, আমার ছাড়পত্র মিললো কী করে।

প্রিয়লাল বলল, সীমা দিদিমণি। বললেন, চিকিৎসক কেমন, তাই আসল। ডিগ্রীর জাত দেখে কী হবে। সবাই কিছু তোমার বরের মতো বিলেতফেরৎ হয় না।

কাটা-ঘা মনে স্নিগ্ধ প্রলেপের মতো লাগল কথাটা। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার সীমা দিদিমণির বুঝি দেমাক নেই, প্রিয়লাল ?

প্রিয়লালের চোখ দুটি যেন আবিষ্ট হয়ে এল।—একটুও না। ভগবান নেহাৎ কচিবয়সেই সব কেড়ে নিয়েছেন, নইলে···

যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই হ'ল। প্রিয়লাল প্রায় মিনিট পনেরো সীমাপ্রশস্তি গেয়ে গেল। শুনতে খুব খারাপ লাগছিল, তা নয়। আগেই বলেছি, সীমা মেয়েটিকে আমারও পছন্দ ছিল। এও লক্ষ্য করেছিলাম, প্রিয়লালের সঙ্গে সীমার সম্পর্কটা ঠিক ভৃত্য প্রভুকন্যার নয়। প্রিয়লালের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, আমরা যাকে চরিত্র বলি, তাও নেই। তবু সেবা দিয়ে হোক, মমতা দিয়ে হোক এই লোকটি সীমার স্নেহ আকর্ষণ করেছিল। দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সহজ প্রীতির একটা সম্পর্ক।

এও জানতাম, সীমার অনেক টুকটাক ফাইফরমাশ প্রিয়লালই খাটে। প্রায়ই বিপন্ন হয়ে প্রিয়লাল আমার কাছে আসত। এমব্রয়-ডারির সুতো চাই দিদিমণির, কিছুতে রঙ মেলাতে পারছে না। লালইম্‌লি উলের নমুনা দিয়েছেন সীমাদি, কিন্তু কোথাও ঠিক এই জিনিসটি পাচ্ছি না।

আরো কতো ফাউ খাটুনি যে প্রিয়লালকে খাটতে হ'ত। কিউরিয়ো দোকান থেকে খুঁজে খুঁজে সীমার বর্ণনামত জিনিস আনা; আর্টিস্টদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে ছবি কেনা কিম্বা সীমাকে আর্ট একজিবিশন দেখান। প্রিয়লালের মুখেই শুনেছি সীমা চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগিণী; ওর ঘরের দেওয়ালে, এ্যালবামে অনেক দুর্লভ সংগ্রহ আছে।

শুধু কি ছবি, প্রিয়লাল বলত, বইয়ের নেশাও সীমার কম নয়। ইংরিজি ভাল জানত না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম লেখকের শেষতম বইয়ের সন্ধানও সীমার ঘরে পাওয়া যেতো। প্রতিমাসের

বাছাইকরা রেকর্ডও। সব কিনত প্রিয়লালের হাত দিয়ে। ডিসপেন-সারিতে এসে কপালের ঘাম মুছতো প্রিয়লাল, হাঁপাতো।—আর বলেন কেন ডাক্তারবাবু, আমি ঘুরে ঘুরে হয়রান।

আমি ঠাট্টা করে বলতাম, তার চেয়ে একটা কাজ করো না প্রিয়লাল। তুমি একটা দোকান খোলো। তা হলে তোমার সীমা দিদিমণির যা-যা চাই সব তোমার কাছে পেয়ে যাবেন।

—সব? মিট মিট করে তাকাতো প্রিয়লাল, বোধহয় কথাটা ঠিক বিশ্বাস হ'ত না।

ঠাট্টাই করি আর যাই করি, সীমাকে, ওর বিচিত্র নানামুখী খেয়ালকে, বুঝতে চেষ্টা করেছি আমিও। মমতা বোধ করেছি এই মেয়েটির জন্যে, জীবনকে সম্পূর্ণ করে পাবার পথ অকালেই যার রুদ্ধ। পথ রুদ্ধ, তবু জীবনকে উপভোগ করবার তৃষ্ণা যায়নি, একটা আতুর, অধীর মন রূপ রস শব্দ স্পর্শে সঞ্জীবনী খুঁজছে, কুড়িয়ে নিচ্ছে যা পাওয়া যায়ঃ একটা ছবি, এক টুকরো কবিতা, কিম্বা একটুখানি গান। সব কামনার রূপান্তর ঘটেছে শিল্পানুরাগে। সীমা রঙে, কথায়, সুরে রচনা করেছে বিকল্পের খেলাঘর।

নেবানো চুরুটটার দিকে ডাক্তারের এতক্ষণে দৃষ্টি পড়লো। বেলা পড়ে এসেছিল। অনেক দূরের চিটুপালু পাহাড়ের গাঢ় নীল আকাশের নির্মেঘ নীলে বিলীন প্রায়। কনকনে হাওয়ায় হাজার ছুঁচ। অনেক কষ্টে ডাক্তারের দ্বিতীয় চুরুটটা জ্বলল। পরম আলস্যে একটা সুখটান দিয়ে বললে, অলমতি বিস্তারেণ। একেবারে আসল রাতটির বর্ণনায় আসা যাক। সত্যি বলতে কি, সে রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, আমি নিজেও ভালো বুঝতে পারিনি। সবটাই কেমন বিশৃঙ্খল, গোলমেলে ব্যাপার, অথচ একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন দুপুরবেলা বুড়ো কর্তার একটা ক্রাইসিস গেল। মারাত্মক রকমের স্ট্রোক, বিকেলের দিকে হেমারেজ হ'ল তাই রক্ষা, নয়ত বাঁচানো শক্ত হ'ত। সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ভেবেছিলুম, আর কিছুক্ষণ দেখে চলে আসব, কিন্তু অন্দর থেকে আপত্তি এল। কখন কী হয় বলা যায় না, রোগীর হার্ট এখনো দুর্বল, রেসপিরেশন ইরেগুলার, আমি যদি আজকের রাতটা—

রোগীকে আরেকবার পরীক্ষা করলুম। অনুরোধটা অসঙ্গত মনে হল না। বাইরে কিছু কাজ ছিল। সারা করে ন'টা নাগাদ ফিরলাম। দেখি সীমা তখনো ওর বাবার শিয়রে বসে। বললাম, মিছিমিছি আর কষ্ট করবেন না, সারাদিন কম ধকল তো যায়নি, শুয়ে পড়ুন গিয়ে। উনি এখন ভালোই আছেন। নিরিবিলিতে ঘুমোতে দিন। আমি তো এ ঘরেই আছি। দরকার মনে পড়ে তো ডেকে নেবো। দরজার বাইরে বুড়ি ঝিটার শোবার বন্দোবস্ত হ'ল। ডাকাডাকির দরকার পড়ে তো এর সাহায্য নেওয়া যাবে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ, মাঝরাত্রে বুড়ি ঝিটার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙলো। প্রথমে শুনলুম চকিত ভয়ার্ত গলা : কে কে? একটু পরে, অ বিন্দাবন বাবু, তোমার এই কাণ্ড? ছি, ছি, কী কেলেঙ্কারি, কেলেঙ্কারি। বেরুতে বেরুতেও আমার আধ-মিনিট মত কেটে গেল, অন্ধকারে দরজাটা আন্দাজ করতে পারছিলাম না। আমি বেরিয়ে আসতেই দেখি একটা লোক হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তাকে চিনতেও পারলুম। প্রিয়লাল। আগেই বলেছি, তখন ওকে সবাই বৃন্দাবন বলে জানত।

ততক্ষণে বারান্দায় ভীড় জমে গেছে। নিচের মহল থেকে ছুটে এসেছে ঝি চাকর, গোমস্তা কর্মচারী, সব। বুড়ি ঝির গলা ক্রমশ চড়ছে, ছি, ছি, ছি।—আমার সারারাত ঘুম হয়নি কো, মাঝে মাঝে

চোখ দুটো শুধু মুদেছি। হঠাৎ যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাদের দিদিমণির ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো বেন্দাবন। আমি যত বলি, কে কে? জবাব দেয় না। আরে আমার চোখকে ফাঁকি দিবি তুই। আমি তোর গোঁফ দেখেই চিনেছি, তুই কেমন শিকারী বেড়াল।

ইঙ্গিতময় গুঞ্জন বয়ে গেল সারা বারান্দায়। অন্ধকারেও সবাই একবার চোখাচোখি করলে। বারান্দার এ-প্রান্তে কর্তাবাবুর ঘর, ও প্রান্তে কলঘর; আর সামনাসামনি সিঁড়ির জায়গাটুকু বাদ দিয়ে একটা মোটে ঘর। কতকটা হলঘরের মতো। পুরনো আমলের পাখাটানার কপিকলের ছিদ্র এখনো বর্তমান। হলঘরখানা দু'ভাগে পার্টিসন করা, একটায় থাকেন বৌরাণী, একটা সীমার। মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের পরিসর আছে; কিন্তু সেটা প্রায় অব্যবহৃতই থাকে, কেন না ননদ-ঠাকুরঝিতে বিশেষ বনিবনা নেই। সীমার ঘরের দরজা দিয়ে প্রিয়লালকে বেরুতে দেখেছে বুড়ী ঝি।

প্রিয়লালের উদ্দেশ্য কী। চুরি? কিন্তু চুরিই যদি হবে, তবে খালি হাতে বেরিয়ে এলো কেন। এই কেনর উত্তর পাওয়া গেল, সমবেত ঝি-চাকরের চোখে চোখে চাপা হাসিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নিচে এলেন বৌরাণী। বারান্দার আলো ইতিমধ্যে জ্বলেছিল। দেখলুম ইন্দ্রাণীর মতো রূপই বটে। অপরিতৃপ্ত ঘুমের অবসাদে চোখদুটি ঈষৎ ফোলা, অঙ্গসম্বদ্ধ নৈশবাসের শিথিলতায় দেহের কঠিন ভঙ্গিগুলো আরো পরিস্ফুট। বললেন, কী হয়েছে, এত গোল কিসের? গরমে ঘুম হয় নি, ছাতে গেছলুম, খানিক আগে। হঠাৎ শুনি চেঁচামেচি! কী হয়েছে?

বুড়ি ঝি বলতে যাচ্ছিল, বৌরাণী, দিদিমণির ঘরের সমুখে—হঠাৎ কঠোর কণ্ঠ শোনা গেল, মানদা! চেয়ে দেখলুম গিন্নীমাও বেরিয়ে

এসেছেন। ঘোমটা নেই, একটা দমকা হাওয়ায় এ-বাড়ির সব পর্দা আজ উড়ে গেছে। গম্ভীর কণ্ঠে গিন্নীমা মানদাকে চুপ করতে হুকুম দিলেন। ওঁর ইঙ্গিতমাত্রে সব ঝি-চাকর পিঁপড়ের মতো নিঃশব্দ সার বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তারপর উনি মেয়ের দরজার সামনে গিয়ে ডাকলেন, সীমা! সীমা! কোন জবাব এলো না। ইতিপূর্বেই ও-ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এর পরেও ও বাড়িতে থাকতে কেমন সংকোচ হচ্ছিল। আমি ডিসপেনসারিতেই আছি জানিয়ে চলে এলুম। নিচের মহলে ঝি-চাকরের জটলা তখনো থামেনি। মানদাকে ঘিরে বসেছে সকলে। মানদা সবিস্তারে বর্ণনা করছে ওর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। একজনকে বলতে শুনলুম, হিন্দুঘরের বিধবা, পুজো-অর্চনা, জপ-তপ, এই সব নিয়ে থাকবি। তা না, দিনরাত গানবাজনা, কেতাব। আর বৈন্দাবনের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস্। সেদিন দেখি, খানকয়েক ছবি বিছানার ওপর, দিদিমণি আর বেন্দাবন উপুড় হয়ে দেখছে। বড়ো ঘরের কেলেঙ্কারি, মরে যাই, মরে যাই।

আজ এদের মুখ বন্ধ হবে না। এতদিন ওরা মুখ বুঁজে শুনেছে, আজ বলার পালা।

পরদিন বেলা ন'টার সময় ও-বাড়ি থেকে আবার জরুরি ডাক এলো: বিষম বিপদ, এখুনি যেন যাই। উপস্থিত হতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগলনা। গিন্নী ইঙ্গিতে সীমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। দরজা ভাঙা। তখন আর বিশেষ কিছু করবার ছিল না। বিষের ক্রিয়া অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, এরা দরজা ভেঙে ঢুকতেই সব স্থির হয়ে গেল। আমি সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখলুম, একটা সুকুমার মুখ মৃত্যুবেদনায় কতটা বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

মাথা হেঁট করে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম। সেদিন নাওয়া

হ'ল না, খাওয়াও না। তারপরেও ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু একটি পেলব মুখের পাশাপাশি প্রিয়লালের হাড়ের খাঁচার মতো দেহটাকে যতোবার কল্পনা করেছি, শিউরে উঠেছি।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার পায়ের কাছ থেকে কতগুলো পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে একটার পর একটা গড়িয়ে দিলে নিচে। বললাম, এই আপনার গল্প ?

—না, আরো একটু আছে। প্রিয়লাল সেই থেকে উধাও হয়েছিল, কিন্তু ও-বাড়িতে আমার দরজা বন্ধ হ'ল না। মাস দুই পরে আবার একদিন ডাক এলো। কার অসুখ ? শুনলুম বৌরাণীর। কী অসুখ ? কেউ বলতে পারল না।

আবার সেই থামের পর থাম, খিলানের পর খিলান, মহলের পর মহল। মেহগিনি খাটে দুধফেনা শয্যা। গলা অবধি পাতলা চাদরে ঢেকে বৌরাণী শুয়ে। পনেরো কলা গিয়ে এক কলা আছে। সেই দৃপ্ত মেয়েটিকে যেন চেনা যায় না। মনে মনে হাসলাম। রোগটা বিরহ নয় তো। স্বামীকে নিয়ে বৌরাণীর দেমাকের সীমা নেই অনেক দিন আগেই প্রিয়লালের কাছে শুনেছিলাম।

আমাকে দেখে বৌরাণী দু'হাতে মুখ ঢাকলেন বটে, কিন্তু আমি তার আগেই মুখখানা দেখে নিয়েছিলাম। শুধু কেঁদে ফোলানো লালপলাশ চোখ দুটি নয়, সারা মুখভর্তি লাল ফুস্কুড়িও। বিষম চমক খেলাম। চিকিৎসা ব্যবসায়ে নেমে সেই আমার প্রথম এবং সব চেয়ে বড়ো শক। প্রশ্ন করি, জবাব পাই না, মেয়েদের রকম জানেন তো। নাড়ি ধরতে দিতেও সঙ্কোচ। অনেক জেরা করে বুঝতে পারলুম, কিছু আগে কোন কোন গ্ল্যাণ্ড ফুলেছিল, অল্প অল্প জ্বরও হ'ত। ফুস্‌কুড়ি শুধু মুখে নয়, সারা গায়েও। না, না মশাই, ঘামাচি-টামাচি নয়। সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল, কিছুদিন যেতেই নিঃসংশয় হওয়া গেল।

আমার উৎসুক চোখের দিকে চেয়ে ডাক্তার আস্তে আস্তে বাক্যটা সম্পূর্ণ করল। বুঝতেই পারছেন, কোন ভদ্রব্যামো নয়; সেই পারা ওঠা রোগ, যার কৃপায় প্রিয়লাল সহস্রচক্ষু হয়েছিল।

* * * *

হিম পড়তে শুরু হয়েছিল। হাতীর পিঠের মতো গোঁদা পাহাড় অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, বুঝলুম আপনার গল্প। ডাক্তারও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল।—বুঝেছেন ? আপনি বুদ্ধিমান বলতে হবে। আমি কিন্তু একটা ব্যাপার আজও বুঝে উঠতে পারিনি। রোগ যদি ইন্দ্রাণীরই হবে, তবে সীমা বিষ খেয়ে মরল কেন ?

মাটির পা

স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে যাবে, চৌকাটের ওপর সুধীরকে দেখে মাধুরী থমকে দাঁড়াল। ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। চুল ভিজে, গা ভিজে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, শাড়িটাও ভিজে। কোনক্রমে শপশপে আঁচলটা জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তখন কি জানত সুধীরের মুখোমুখি পড়ে যাবে।

সুধীর ওকে দেখে মাথা নামাল, তার আগে হাসল একটু। মাধুরী হাসিটুকু ফিরিয়ে তৈরী হতে ভিতরে গেল।

একটু পরেই বেরিয়ে এল চিরুনী হাতে। ধবধবে শাদা থান আর শেমিজ পরণে, হাসিটুকু এখন কাল চোখ ছাপিয়ে পড়েছে কপোলে, আরও গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত থেমেছে ঠোঁটের কোণে, একটু বেঁকে গিয়ে। ঘোমটা নেই, খোলা চুলগুলোর ভেতর দিয়ে টান টান করে চিরুনী চালিয়ে মাধুরী বলল, 'এস সুধীর।'

'না মাধুরীদি। পরে। বাজারে যাচ্ছি। আপনাদের কিছু দরকার আছে কিনা জানতে এসেছিলাম।'

'দাঁড়াও ভেবে বলি। বাবাই ত বাজারে গেছেন আজ, শরীরটা ভাল আছে কিনা একটু। তুমি আমার জন্যে আমড়া এন দু'পয়সার। আজ একটু অম্বল খাব ভাই।'

সিঁড়ির কোনে রান্নাঘর। সুধীর চলে গেলে মাধুরী সেখানে এল গুণ্ গুণ্ করতে করতে। করবী ডিশ পেয়ালা ধুয়ে রাখছিল, মাধুরী বলল, 'আমার দিকে তাকা দেখি।'

'কী।'

মনে মনে কী হিসেব করে মাধুরী বোনের দিকে দু'টো আঙুল বাড়িয়ে দিল। বলল, 'একটা ধরবি।'

করবী ধরল তর্জনীটা। মাধুরী বলল, 'হল না। আচ্ছা, আরেকবার।'

এবারেও করবী তর্জনীই ধরল। ভ্রূ কুঁচকে মাধুরী বলল, 'এবারেও না। আচ্ছা আরেকবার। বারবার তিনবার।'

এবারে করবী ধরল মধ্যমা। খুশি হয়ে মাধুরী বলল, 'হয়েছে।'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে করবী বলব, 'কী হয়েছে দিদি ?'

'ও কিছু না।' মাধুরী বলল, 'দেখছিলাম আজ কারুর চিঠি আসবে কিনা।'

করবী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'মিছিমিছি মিছে কথাটা বানালে দিদি। আমাকে ঠকাতে তুমি পারবে না। তুমি দেখছিলে সুধীরদা তোমাকে ভালবাসে কিনা।'

বোনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল মাধুরী। তারপর চাপা কঠিন স্বরে বলল, 'যদি বলি তাই।'

'তা হলে বলব তোমার মত ভণ্ড দু'টি নেই। মন না রাঙায়ে কাপড় রাঙালে যদি যোগীদের দোষ হয়, তবে মনের রঙ ধুয়ে না যেতে কাপড়ের রং ধুয়ে ফেলে তুমিও অন্যায় করছ দিদি।'

সেই মুহূর্তে বারুদের মত ফেটে পড়ল মাধুরী। 'অতো সাধুপনা দেখাসনে বুঝলি। তুই কত ডুবে ডুবে জল খাস তাও আমার জানা আছে। সুধীর তোকে লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে এনে পড়তে দিত শুধু পাতার ভাঁজে চিঠি চালান দেবার জন্তে, তা যদি আমার জানা না থাকত। তখন তবু আড়াল আবডাল ছিল, এখন ত খোলাখুলিই সব করছিস।'

'দিদি চুপ কর।'

'চুপ করব কেন, বাবাকেও দরকার হলে বলব। আমি বিধবা আমাকে কিছু করতে নেই, যত ভালবাসা সব বুঝি তোমার একচেটে, না? গুণ্ডারা তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ভুলিস না।'

'থামলে কেন। আর?'

'তুই বলে হাসাহাসি করিস করবী। আমি হলে কোন্ কালে ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতাম।'

জের চলল রাত পর্যন্ত।

বিছানা ঠিক করে দিয়েই করবী বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে আঁচলে টান পড়ল।

করবী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী চাই।'

'জল দিয়ে গেলে না।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট দংশন করল করবী।

'আমার আঁচল ত অন্য এক জনের মত ভিজে নয় সুধীরদা যে নিংড়ালে জল পড়বে। ছাড়, এনে দিই।'

ছেড়ে দিয়ে সুধীর বলল, 'বড় তেজ যে। তবু যদি—'

'তবু যদি কী।'

'কিছুনা। জানি না।'

'আমি জানি। তবু যদি তোমারই বাসার একতলার দু'খানা ঘরে শস্তায় থাকতে না দিতে। সেজন্যে আমরা ত সপরিবারে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ সুধীরদা। বাবাকেও রেশনের দোকানের চাকরিটা তুমিই জুটিয়ে দিয়েছ।'

সুধীর বলল, 'তোমার জিভে বড় বিষ করবী।'

অফিসে যাবার পথে সুধীর দাঁড়িয়ে গেল ওদের ঘরের সামনে।

'তোমার বইখানা পড়া শেষ হল করবী? হয়ে থাকলে দাও, বদলে দিই।'

করবী বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা বই এনে দিল সুধীরের হাতে।

'পড়া হয়েছে?'

'না।'

'তবে রেখে দাও না হয় আর দুদিন?'

'দরকার নেই। আমি আর এ সব বই পড়ব না সুধীরদা।'

'হঠাৎ অরুচি?'

'অরুচি নয়। কিন্তু লাভ নেই এ সব পড়ে। শুধু অস্থিরতা বাড়ে। সে সময়টা তবু শেলাই টেলাই করলে কাজে দেয়। তুমি আমাকে শেলাই শেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পার না সুধীরদা?'

ব্যঙ্গের স্বরে সুধীর বলল, 'দেখি খোঁজ খবর করে।'

বইটা নিয়েই চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাধুরী এল ছুটতে ছুটতে। 'বইটা নিয়ে চলেছ আজকেই? আমার যে এখনো শেষ ক'পৃষ্ঠা পড়া হয়নি ভাই। আর একটা দিন রাখ না।'

শুকনো গলায় সুধীর বলল, 'তা হয় না মাধুরীদি। দেখছেন না আজই ফেরৎ দেবার শেষ দিন? অফিস লাইব্রেরি, দিন পিছু এক আনা ফাইন। নিয়ে যাই, বরং পারি ত রিনীউ করিয়ে নিয়ে আসব।'

মাধুরীর মুখ কাল হয়ে গেল। 'থাক থাক। ফাইনটাইন দিয়ে কাজ নেই ভাই। আমরা এসেছি মুখ্যু, যাবও মুখ্যু, মাঝখানে গণ্ডগোল করে লাভ কী।'

লুকোতে গিয়েও মাধুরী লুকোতে পারল না। করবী ঘরের ভিতর এসে পড়েছে।

'আয়না নিয়ে কী করছিলে, দিদি।'

ঘাড় ফিরিয়ে হেসে মাধুরী বলল, 'দাঁতটা বড় কন কন করছে রে। দেখছিলাম।'

ইচ্ছে করলে করবী উপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু কেমন রোখ হল ঘা দেবার। 'কানে দুল পড়লে বুঝি দাঁত কনকন সারে দিদি।'

কাঁদো কাঁদো গলায় মাধুরী বলল, 'তুই শুধু বাঁকা বাঁকা কথা বলতেই শিখেছিস করবী। আমার জিনিস, সব সাধ আহ্লাদ ত ঘুচে গেছে, একটু নাড়াচাড়া করতেও দোষ?'

'দোষ আবার কী দিদি। আজকাল ত বিধবারা এ সব পরছেও।'

খুশি হল মাধুরী। তবু বলল, 'পরুকগে। আমি পরব না, তোর বিয়েতে দিয়ে দেব। আমার কি আর সে বয়স আছে। এই ত আশ্বিনে ছাব্বিশ পূর্ণ হয়ে—'

করবী হেসে ফেলল। 'মিছিমিছি বয়স কমাচ্ছ দিদি। আমারই এই পঁচিশ চলছে। আমার চেয়ে পাঁচ বছর তিন মাসের বড় তুমি, না? তা হলে তোমার এখন অন্তত তিরিশ।'

মাধুরী রাগ করল। পট পট করে দুল দু'টো খুলে বাক্সে রাখল। 'তুই বড় অঙ্কবাগীশ হয়েছিস করবী, খুব হিসেব শিখেছিস। অত হিসেব অঙ্ক কষাকষি শ্বশুর বাড়ি গিয়ে বরের টাকা পয়সা নিয়ে করিস, বুঝলি। সুখ্যাতি হবে।'

ছায়াথমথম মুখে করবী বলল, 'শ্বশুর বাড়ি আমার হবে না সে তুমি ভাল করেই জান দিদি। এই একটা ব্যাপারে আমাদের দু' বোনের কিন্তু খুব মিল। তোমার ঘুচে গেছে জন্মের মত; আমার এ জন্মে হবেই না।'

ছোট ছেলেকে সান্ত্বনা দেবের ভঙ্গিতে মাধুরী করবীর কপাল থেকে দুচারটে চুল সরিয়ে দিল। 'হবে হবে, তুই জানিস না, বাবা খুব চেষ্টা করছেন।'

সত্যি সত্যিই তার পরদিন শ্রীকান্তবাবু ওকে দেখতে এলেন। বর্ষার বিকেলে লাঠিঠুকঠুক আবির্ভাব। হাঁটু-ধুতি, কাটাকনুই কামিজ, কদম চুল। এসেই, সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই, ফরমাস করলেন, 'একটু জল। পা ধোব।'

পা ধোবার মত জল এল। কাদাও আধ হাঁটু। বেশ রগড়ে ধুলেন। মিনিট আষ্টেক পর মাথা তুলে বললেন, 'গামছা?'

তাও প্রস্তুত। ফের ফিতে বাঁধলেন জুতোর। ফিটফাট খুশিতে বললেন, 'আনুন দেখি এবারে আমাদের কনে।'

এই নাকি শ্বশুর। এই রুচি! করবীর মুখ কালো হয়ে গেল। তবু চুল খোলা, হাঁটি হাঁটি পা পা ইত্যাদি যথারীতিই হল। মাধুরীর শেলাই করা টেবিল ক্লথের কোণা নাড়তে নাড়তে শ্রীকান্তবাবু বললেন, 'তুমি করেছ?'

করবী শিক্ষামত ঘাড় নাড়ল।

অতঃপর জলযোগ। সিঙারা ভেঙে গালে পুরতে পুরতে শ্রীকান্তবাবু বললেন, 'এঁঃ, ন্যাতানো। তেলে ভাজা নয়ত বেয়াই মশায়।'

তেলে ভাজার ইঙ্গিতে নিবারণবাবু জ্বলে উঠছিলেন, বেয়াই সম্বোধনে জল হলেন। মেয়ে তা হলে পছন্দ হয়েছে। হরে লবে কাটাকুটি হয়ে মুখে একটা অনির্বচনীয় ভাব ফুটে রইল।

'তা কেন হবে! খাঁটি ঘি, প্রসাদ ঘোষের দোকানের খাবার তেলে ভাজা! তা যা বলেছেন তেলে ভাজাই ত।'

এগিয়ে দিতে একেবারে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত গেলেন নিবারণবাবু। ফিরে এসে মাধুরীকে বললেন, 'বেশ পছন্দ হয়েছে মনে হল।' করবীর দিকে চেয়ে বললেন, 'এখানেই তা হলে কথা দি?'

করবী মাথা নীচু করল। মৌন সম্মতি।

সিঁড়ির নিচে রান্নাঘর। পরদিন সকালে করবী চা করতে বসেছে, সুধীর সেখানে এসে হাজির।

বলল, 'শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছ শুনলাম।

করবী উনুন থেকে কেৎলি নামিয়ে বলল, 'সবাই যায়।'

সুধীর বলল, 'সবাই যায়। কিন্তু—'

'কিন্তু সবার সে সুখ সয় না, এই কথা বলবে ত। বিশেষ করে আমার মত যে সব মেয়ের কলঙ্ক আছে, না?' তা কত মেয়ের ত খোস পাঁচড়া, এমন কি শ্বেতী রোগ লুকিয়েও বিয়ে হয়। আমারও না হয় তাই হবে।'

করবী চা ঢালতে যাচ্ছিল, সুধীর ওর হাত চেপে বলল, 'খুব স্ফূর্তি যে। মনে একটুও কষ্ট হবে না তোমার?'

'আপাতত হাতখানার ত হচ্ছে। ছাড় দেখি, গরম জল ঢেলে পড়বে।'

'তোমার একটুও মায়াদয়া নেই?'

স্থির চোখে সুধীরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে করবী বলল, 'আচ্ছা, সুধীরদা, তুমি এসব কথা বাবাকে বলতে পার না?'

এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল সুধীর যে মিনিটখানেক পলকই পড়লো না। 'তোমার বাবাকে বলব! ভালবাসার কথা?'

'ভালবাসার কথা কেন বলবে। বিয়ের কথা। আমাদের দেশে ত ভালবাসা-টাসা বিয়ের পরই হয়।'

'বিয়ে, তোমাকে?'

করবী এতক্ষণে হেসে ফেলল।

'তুমি বুঝি শুধু ভালবাসার কথাই ভেবে দেখেছ, বিয়ের কথা নয়? বুঝতে পারিনি। মুসলমানে ছোঁয়া মেয়ের সঙ্গে শুধু ভালবাসাবাসি

চলে আর বিয়ে করলে জাত যায় ?' পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে করবী বলল, 'এবার পথ ছাড়।'

'ছাড়ব না।'

করবীর নীরব চোখের ঘৃণার যদি তাপ থাকত, সুধীর সেই মুহূর্তে অন্ধ হয়ে যেত। বহু প্রয়াসে আত্মসংবরণ করে করবী আবার বলল, 'পথ ছাড়। আর একটা কথা শোন। তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না আমাকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের অমানুষ বলে মনে কর, কিন্তু তুমি তাদের চেয়েও অধম। আমার ওপর তাদের লোভ ছিল, সেই সঙ্গে সাহসও ছিল। তোমার লোভ ষোল আনা আছে, কিন্তু সাহস এককড়াও নেই সুধীরদা।'

কেলেঙ্কারি বিয়ের জন্যে নির্দিষ্ট রাত্রেও কম হল না কিন্তু সেই রাত্রেই করবী—মাধুরীর এক নতুন রূপ দেখল।

পাউডার বারবার ধুয়ে যাচ্ছে ঘামে, চন্দনের ফোঁটাও থাকছে না। মাধুরী হাত-পাখা নিয়ে বসল বোনের পাশে। বলল, 'একটু শান্ত হয়ে ব'স দেখি। সবারই বিয়ে হয়।'

করবী দিদির শাদাথান কোলে মুখ গুঁজল 'বড় যে ভয় করছে দিদি।'

'ভয় কিসের। বাবা আছেন। আমরা আছি। লগ্নের আর আধ ঘণ্টা মোটে দেরি। নে, এগুলো পর।'

একটা একটা করে গহনা মাধুরী পরিয়ে দিতে লাগল। করবী অবাক হয়ে বলল, 'সব দিয়ে দিচ্ছ দিদি ? এগুলো ত তোমার।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মাধুরী বলল, 'আমার আর কোন্ কাজে লাগবে। তুই-ই নে। আশীর্বাদ করি তোকে যেন এগুলো বাপের বাড়ি ফিরিয়ে না আনতে হয়।'

লগ্ন এসে এড়ল। নিবারণবাবু এ-ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন, 'তোরা তৈরি? বর আনতে যাচ্ছি।'

মাধুরী উঠে এসে চাপা গলায় বলল, 'সব ঠিক আছে ত বাবা? কিছু জানাজানি হয়নি?'

'এখন পর্যন্ত ত না। এখন ভরসা নারায়ণ।'

কিন্তু নিবারণবাবুকে নিজে থেকে যেতে হল না। একটি ছেলে এল ছুটতে ছুটতে। বরকর্তা নিবারণবাবুকে স্মরণ করেছেন।

পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় বরযাত্রীদের বসবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। নিবারণবাবু সেখানে করজোড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীকান্তবাবু একখানি আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান ছিলেন। সোজা হয়ে বসে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'এসব কী শুনছি।'

কী শুনেছেন জিজ্ঞাসা করতে হল না। শ্রীকান্তবাবু একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন, 'পড়ুন; এইমাত্র পেয়েছি।'

পড়তে পড়তে নিবারণবাবুর কপালে ঘাম ফুটে উঠল। উড়ো চিঠি। পাকিস্তানে থাকাকালে নিবারণবাবুর একটি মেয়েকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি তদন্তের পর পুলিশের সাহায্যে মেয়েটি মাসখানেক পর উদ্ধার পায়। পরে মেয়ে দু'টিকে নিয়ে নিবারণবাবু কলকাতা চলে আসেন। এসে ওঠেন দূরসম্পর্কের এক শালীর ছেলের বাসায়। শ্রীকান্তবাবু কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, যার সঙ্গে আজ ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন সেই মেয়েটিই দুর্বৃত্তস্পৃষ্টা কিনা? যদি হয়, তবে সব জেনেশুনেও কি তিনি এ-বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন? যদি থাকেন তবে অবশ্য বেনামা পত্র-প্রেরকের বলবার কিছু নেই।

কানাকানির ছোট ছোট ঢেউয়ে খবরটা ইতিপূর্বেই ছড়িয়ে গেছে বিয়ে-বাড়িতেও। বরকর্তা বলেছেন বিয়ে হবে না। কেন, কেন। কে

জানে মশায়, কেন? হয়ত নির্ধারিত বরপণ সংগ্রহ হয়নি, হয়ত বরযাত্রীদের সিগারেটের সঙ্গে দেশলাই দিতে ভুল হয়ে গেছে। লক্ষ কথা ছাড়া হিন্দু মেয়ের বিয়ে হয় না, আবার একটা কথাতেই ভেঙে যায়। পাড়ার কটি ছেলে বাল্‌ব ইত্যাদি নিয়ে বিয়ের আসরে আরেকটু জোর আলোর বন্দোবস্ত করছিল, তারা কি করবে ঠিক না করতে পেরে দাঁড়িয়ে রইল। . কন্যাপক্ষের পুরোহিত শালগ্রাম শিলাটিকে ফের বাঁধবেন কিনা ভাবছেন—আর সব কলরব স্তব্ধ।

মাধুরীর কোলে করবী মূর্চ্ছাতুরের মত পড়ে আছে। সুধীর এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। কোমরে কষে বাঁধা কাপড়, হাফ শার্ট, উস্কোখুস্ক চুল, সুধীর আজ সারাদিন খুব খাটছে।

'মেসোমশাই আপনাকে ডাকছেন, মাধুরীদি।'

করবীর মাথাটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে মাধুরী উঠে এল। 'কী ব্যাপার সুধীর।'

সুধীর চাপা গলায় বলল, 'ওঁরা কী করে করবীর সেই ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন—উড়ো চিঠি। আপনি এখুনি একবার চলুন।'

ঘরের ভিতর থেকে অস্ফুট একটা কাতরোক্তি শোনা গেল, চকিত হয়ে তাকাল সুধীর। করবী কখন উঠে বসেছে—সেই রক্তাম্বর পরনে, আরক্ত ভাষাহীন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে।

সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে প্রবল একটা ভাবান্তর ঘটে গেল সুধীরের। রক্তোচ্ছ্বাসে মুখ ভরে গেল। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে সুধীর বলল, 'আজ সারাদিন মাথার ঠিক ছিল না, মাধুরীদি। কেবল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এখন আর কোন সংশয় নেই। যদি ওঁরা' বলতে গিয়েও সুধীর পলকের জন্যে ইতস্তত করল, 'যদি ওঁরা আজ চলেই যান, তবে আমিই করবীকে বিয়ে করব।'

'তুমি!' মাধুরী চলতে শুরু করেছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি!'

দৃঢ়তার সঙ্গে সুধীর বলল, 'আমি। করবীর জীবনটা এভাবে নষ্ট হতে আমি দেবো না। আপনি মেসোমশাইকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলুন মাধুরীদি।'

শাদা কাপড়ের ঘোমটার নিচে শুকনো শাদা মুখ। সামান্য একটু হাসতে চেষ্টা করে মাধুরী বলল, 'বাবাকে কী বলতে হবে সে আমার ভাল করেই জানা আছে। কিন্তু তোমাকে খোলাখুলি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুধীর। আজকের এই উড়োচিঠি তুমি দাওনি?'

পাংশু মুখে সুধীর বলল, 'ছি মাধুরীদি। আমাকে আপনি এত ছোট মনে করলেন। আমি কি চাই না করবী সুখী হ'ক?'

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। নিবারণবাবু তখনও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। আশে পাশে, জানালায়, দরজার আড়ালে কৌতূহলী ভীড়।

'সব কথা সত্যি তা হলে। এই মেয়েই তা হলে যবনস্পর্শদুষ্টা? হ্যাঁ কিম্বা না বলুন,' শ্রীকান্তবাবু হাকিম গলায় ধমক দিলেন, 'অবশ্য যা ব্যবহার করেছেন আমাদের সঙ্গে, আপনাকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, তবু আপনার মুখের কথাই শুনতে চাই।'

ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল মাধুরী। খোলা ঢালা চুল, অবিন্যস্ত গুণ্ঠন, কৃশ মুখখানায় দারুণ দীপ্তি। এদিক ওদিক তাকিয়ে মাধুরী বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন, তাঐ মশাই, আর জানালার কাছ থেকে লোকজন সরে যেতে বলুন। সব কথাই বলব আমি।'

শ্রীকান্তবাবু জিজ্ঞাসু চোখে নিবারণবাবুর দিকে তাকালেন। নিবারণবাবু তখনও নতমস্তক। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললেন, 'আমার বড় মেয়ে।'

'বাবার বয়স হয়েছে,' বন্ধ ঘরে মাধুরীর গলা আরও গম্ভীর শোনাল, 'তা-ছাড়া রোগে শোকে আঘাতে উনি একেবারে জর্জর হয়ে আছেন। যা জিজ্ঞাসা করবার আছে, আমাকে করুন।'

হাতের চিঠিখানা দেখিয়ে শ্রীকান্তবাবু বললেন, 'এ চিঠির কথা তুমি জান?'

'জানি।'

'এতে যা লেখা আছে, সে সব কথা সত্যি?'

'মোটামুটি।'

'তা হ'লে তোমার ভগ্নী—'

মাধুরী নতমুখে বলল, 'ওইখানেই আপনার হিতৈষী একটু ভুল খবর দিয়েছেন তাঐ মশাই। আমার বোনকে নয়—গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমাকেই।'

নিবারণবাবু এতক্ষণ চিত্রার্পিত পুতুলের মত ছিলেন, চঞ্চল হয়ে বলে উঠলেন, 'মাধুরী!'

সেদিকে শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মাধুরী বলল, 'চুপ কর বাবা। আমি জানি প্রাণ গেলেও তুমি সত্যি কথাটা স্বীকার করতে পারতে না। কিন্তু সংকোচের আর সময় নেই। মিথ্যে একটা কলঙ্কের জন্যে করবীর সুখ-শান্তি, ভবিষ্যৎ সব নষ্ট হতে বসেছে দেখছ না?'

একটু দম নিল মাধুরী, তারপর শ্রীকান্তবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'নিজের কথা নিজের মুখে বলতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে তাঐ মশায়, কিন্তু লজ্জা করবার সময় এটা নয়। তবে শুনুন।

'খুব কম বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল, কম বয়সেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসি। মা কিছুদিন পরেই মারা গেলেন, বাড়িতে মেয়ে অভিভাবক কেউ ছিল না। সেই বয়সেই কতকটা গিন্নী হয়ে পড়লাম। আমার চলাফেরায় বাবা কখনও বাধা দিতেন

না। কিন্তু করবীর তখন উঠতি বয়স। ওকে সাবধানে রাখা হত, বাড়ির বাইরে বেরুতে দেওয়া হত না।

'যে-ঘটনার কথা চিঠিতে লেখা আছে, সেটা যখন ঘটে করবী তখন গ্রামেই ছিল না। ভয়ে ভয়ে বাবা ওকে আগেই মামারবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমারও চলে আসবার কথা ছিল, কিন্তু এলে বাবাকে দেখবে কে, সেই জন্যে আসা হয়নি। জমি-জমার একটা বন্দোবস্ত করতে পারলেই আমরা সবাই চলে আসব ঠিক হয়েছিল।'

আঁচলে কপালের ঘাম মুছে মাধুরী ফের শুরু করল, 'যেদিন— যেদিন ঐ ঘটনা ঘটে, সেদিন বাবা বাড়ি ছিলেন না। কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত, টিপ টিপ বৃষ্টি। এক প্রহর হয়ে গেল তবু বাবা ফিরছেন না কেন দেখবার জন্যে দরজাটা একবার খুলেছি, ওমনি—'

বলতে বলতে গলা ধরে এল মাধুরীর, আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল। শ্রীকান্তবাবু বললেন, 'থাক্ মা থাক্। সব বুঝতে পেরেছি আমি।'

কতকটা সামলে নিয়ে মাধুরী বলল, 'তারপর একটা মাস আমার ওপর দিয়ে কী গেছে, আপনি পিতৃতুল্য, তবু আপনাকে বলতে পারব না। বাবা লোকজন পুলিশ দিয়ে আমাকে যখন উদ্ধার করে আনলেন, তখন আমার দেহ কঙ্কালসার, ঘন ঘন মূর্চ্ছার ব্যামো, সেরে উঠতে দু'টি মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। মনের দাগ দেখান যায় না, কিন্তু আমার গায়ে এখনও তার অনেক চিহ্ন আছে তাঐ মশায়। এই দেখুন—'

বলতে বলতে মাধুরী ওর কপালে, কনুইয়ের ওপরে, গলার কাছে কয়েকটা শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন দেখালে।

শ্রীকান্তবাবু অপ্রতিভ গলায় বললেন, 'থাক্ মা, থাক্। তুমি ভিতরে যাও।'

'যাচ্ছি। অকপটে আপনাকে সব বললুম। আমার অদৃষ্টে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আমার বোন ফুলের মত পবিত্র। এখন আপনার যা বিবেচনা হয় করুন।'

আবার চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎ প্রবাহের মত। শ্রীকান্ত-বাবু নাকি বিয়ের মত দিয়েছেন। সামাজিক মানুষ, তাই প্রথমটা দ্বিধা করেছিলেন, কিন্তু একের দুর্ভাগ্যের জন্য অপরকে দায়ী করার মত অমানুষ তিনি নন।

কোনদিকে দৃকপাত না করে মাধুরী দ্রুত পায়ে ফিরে এল ঘরের মধ্যে। করবী তখনো উপুড় হয়ে শুয়ে আছে দু'হাতে মুখ ঢেকে। ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে মাধুরী ফিসফিস করে বলল, 'এই করবী, ওঠ। শুনছিস ছুঁড়ি, তোর শেষ পর্যন্ত বিয়ে হবে।'

স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল কবরী, মাধুরী আবার যত্ন করে বেঁধে দিল। বলল, 'ঈশ্, কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টো লাল করে ফেলেছিস। যা জল দিয়ে আয়। নতুন করে আবার কাজল পরতে হবে।'

করবী ইতিমধ্যে সব শুনেছিল। স্থির চোখে মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'একী করলে দিদি! আমাকে বাঁচাতে গিয়ে সব কলঙ্ক নিজের বলে নিলে?'

মাধুরী বলল, 'ওসব থাক।'

করবী শুনল না। বলে চলল, 'আমি তোমার বোন অথচ তোমার পায়ের ধুলোরও যোগ্য নই। আমার জন্যে সংসার, সুখ-শান্তি কিনে দিতে তোমাকে যে কত বেশি দাম দিতে হল, সে আমি মেয়ে হয়ে বেশ বুঝতে পারি। তোমার ঋণ জন্মেও তো শোধ হবে না দিদি।'

শ্বশুরবাড়িতে করবী দিনচারেক মাত্র ছিল, তারপর সুধাংশু ওকে নিয়ে গেল নিজের কর্মস্থলে। এক হিসেবে ভালই হল। শ্বশুরবাড়ির কটা দিন করবীর কেটেছে দুঃস্বপ্নের মত। আদর যত্নের ত্রুটি ছিল না, তবু করবীর মনে হত, লোকগিশগিশ এই বাড়িটায় প্রতিটি চোখে যেন অসীম কৌতূহল, অশোভন জিজ্ঞাসা।

শ্রীকান্তবাবু কাউকে বলেন নি, সুধাংশুও চেপে গেছে, তবু কী করে যেন জানাজানি হয়ে গেছে কথাটা। কানাঘুষার খবর, ওপর-ওপর শোনা, বৃত্তান্তটা করবীর মুখেই যেন ভাল করে শুনতে চায় সকলে। শাশুড়ি তাকান, জামতাড়া থেকে এসেছে মেজ ননদ, সেও। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে না কেউ, পাছে বৌ কিছু মনে করে। তবু, টাটানগর থেকে বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছেন মামীশাশুড়ি, রাশভারি লোক, পানের সরঞ্জাম নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে যখন বলতেন, 'তারপর, বৌমা তোমার বাপের বাড়ির কথা বল', অমনিই করবীর বুক ঢিপ ঢিপ করত।

বাপের বাড়িতে শুধু তুমি, বাপ আর বড় বোন? মা নেই? আহা। কত বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল বড় বোন, ছেলেপুলে ক'টি। একটিও নেই? আহা। বিধবা হল যদি, বাপের বাড়ি ফিরে এল কেন? শ্বশুরকুলে কে-কে আছে? দেওর ভাসুররা বুঝি খোঁজ খবরও নিত না? আহা।

অনেক লুপ লাইন ঘুরে ঘুরে এলেও সব প্রশ্নের লক্ষ্যই এক —করবী ঘেমে উঠত।

সুধাংশু ওকে বাঁচিয়ে দিল। চাকরিতে যেদিন ফিরে যাবার কথা তার আগের দিন মাকে বলল, 'বৌকেও নিয়ে যাই মা। চাকরের রান্না খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেল।'

অপ্রসন্ন কণ্ঠে মা বললেন, 'বেশ, নাও।

সুধাংশুর কর্মস্থলটা কিছু দূরে। বড় লাইন, মেজ লাইন, ছোট

লাইনের পরও মোটর বাসে যেতে হয় খানিকটা। নতুন বাসায় এসে গুছিয়ে নিতেও দিন দুই সময় লাগল। তারপর প্রথম ফুরসুৎ পেয়েই করবী মাধুরীকে চিঠি লিখতে বসল।

প্রথমে শুরু করল বাসাটার বর্ণনা দিয়ে। দু'খানা ঘর, পাশাপাশি। উঠোনটুকু পেরিয়ে রান্নাঘর। আঁচ দিলে ধোঁয়া অন্যদিকে বেরিয়ে যায়, কলকাতার মত ঘরে ঢোকে না। কল নেই, কুয়ো, তা হক, ঠাণ্ডা টলটলে জল, পাড় বাঁধান। জায়গাটা শুধু ঘিরে নিতে হবে। ঘরের দাওয়া ঘিরে ঘাস, ওখানটা সাফ করে ফুলের চারা লাগাবে করবী। সব আস্তে আস্তে।

তারপর লিখল, আমাদের দু'বোনের কারুরই কিছু ছিল না। আমি ত সব পেলাম একে একে। সংসার সুখ, স্বামী। দিদি, তুই?

'কাকে লিখছ, দিদিকে?'

করবী চমকে তাকাল। চট করে কাগজগুলো লুকিয়ে ফেলল বালিশের তলায়। সুধাংশু একেবারে ওর পিঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। বলল, 'তোমার দিদিকে, যাই বল, আমার ভয় করে কিন্তু। কী তেজী। আমি ত সে-রাত্রে থ' হয়ে গিয়েছিলাম।'

করবী বলল, 'আমার দিদির মত মানুষ হয় না। আমার জন্যে ও অনেক করেছে।'

সুধাংশু পুরোপুরি তাৎপর্য বুঝল না কথাটার। ঠাট্টা করে বলল, 'আর আমি?'

করবী বলল, 'তুমিও। অন্য কেউ হলে হয়ত বিয়েই করত না। অন্তত ইতস্তত করতই।'

বালিশে মুখ ঢেকে শুয়েছিল মাধুরী। পায়ের শব্দে চোখ মেললে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল ধড়মড় করে।

'একি করবী তুই! কবে এলি? বাঃ রে, চিঠিপত্রও ত দিতে হয়।'

পাখাটা হাতে নিয়ে করবী ধপ করে বসে পড়ল। 'কাল এসেছি, শ্বশুরবাড়িতে উঠতে হয়েছে। আসা কি সহজ! আছি সেই নির্বাসনে। ছুটিই পায় না, ছুটিই পায় না। আমি শেষ পর্যন্ত জোর করে ধরে নিয়ে এলাম। তাও ছমাস বাদে।' বলতে বলতে মাধুরীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল করবী। 'কিন্তু তুই কী রোগা হয়ে গেছিস দিদি? চোখে কালি, কণ্ঠা বেরুনো, একী চেহারা হয়েছে তোর!'

মাধুরী আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। সরে বসল দেয়াল ঘেঁসে। বলল, 'তুই ত মোটা হয়েছিস, ভরে উঠেছিস, তা হলেই হল।'

হাত বাড়িয়ে মাধুরী করবীর গলার হারটা স্পর্শ করল। 'বিয়ের সময়কার?'

'নতুন করে ভেঙে আবার গড়েছি, লকেটটা এবার বেশ ভারি হয়েছে, না?'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখলে মাধুরী, সব জিজ্ঞাসা করল।

করবী বলল, 'এবারে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব তোকে। ওখানকার জল-হাওয়ায় সেরে আসবি।'

হঠাৎ কি হল, মাধুরী ফের শুয়ে পড়ল, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। 'আমি আর যমের বাড়ি ছাড়া কোথাও যাব না। বড্ড মাথা ঘুরছে, একটু হাওয়া দিবি, ভাই?'

মাথাটা কোলে টেনে নেবে বলে করবী হাত বাড়িয়েছিল, মাধুরী হঠাৎ ওকে ঠেলে দিল দূরে। উঠে বসে বিকৃত, থুথু চাপা স্বরে বলল, 'সর, সর দেখি। রাস্তা দে। আমি বাইরে যাব।'

মাধুরী বেরিয়ে যাবার একটু পরেই সুধীর ঘরে ঢুকল। একটা শিশি বাড়িয়ে দিয়ে বলতে যাচ্ছিল, 'ওই ওষুধটা—' হঠাৎ যেন টের পেল মাধুরী নয়, কবরী। দু'পা পিছিয়ে গেল।

করবী উঠে এসে প্রণাম করল।

'চমকে গেলে সুধীরদা? চিনতে পারছ না,—না আমি এসেছি জানতে না?' শিশিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দিদির ওষুধ?'

তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে সুধীর বলল, 'না। আমার।'

কলতলা থেকে মাধুরীর সাড়া পাওয়া গেল। প্রাণপণ প্রয়াসে দমন করতে চাইছে নিজেকে।

করবীর মুখে কঠিন হাসি ফুটল। 'তোমার ওষুধ, তবে দিদিকে দিতে এসেছিলে কেন?'

জবাব পাবার আগেই মাধুরী ঢুকল ঘরে। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে এসেছে। মাথা নীচু করে সুধীর বেরিয়ে গেল।

করবী আবার বলল, 'কী হয়েছে দিদি?'

জানালার শিক ধরে মাধুরী বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, 'কিছু না। আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারিস?'

এগিয়ে এসে করবী হাত রাখল দিদির পিঠে। 'আমার কাছে কেবলই লুকোচ্ছিস। কিন্তু মেয়ে হয়ে মেয়েমানুষের চোখে কী করে ধুলো দিবি তুই। আমার চোখে চোখ রেখে বল ত, যা ভেবেছি তাই কিনা।'

দু'হাতে চোখ ঢাকল মাধুরী। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

করবী বলল, 'ছি দিদি, ছি। বাবা জানেন?'

মাধুরী মাথা নাড়ল। তারপর ছেলেমানুষের মত করবীর দুটো হাত চেপে ধরে বলল, 'তুই আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলি। তাই

নিয়ে চল করবী, তারপর—তারপর না হয় দূর করে দিস। বাবাকে এ-মুখ দেখাতে পারব না। নিবি?'

'নেব।' করবী দৃঢ় স্পষ্ট উচ্চারণ করল। তারপর, বিয়ের রাত্রে মাধুরী যেমন করে ওকে টেনে নিয়েছিল, তেমন করে টেনে নিল মাধুরীকে। বলল, 'শুধু আমাকে তার নামটা বল।'

মাধুরী নিস্পন্দের মত পড়ে রইল। করবী এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'তবে আমিই বলছি। সুধীরদা, না?'

মাধুরী এবারেও জবাব দিল না। করবী কঠিন গলায় বলল, 'বুঝলাম। চুপ করে থাকাটাই জবাব। আরেকটা কথা। সেদিন আমার শ্বশুরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন সব কলঙ্ক নিজের বলে মেনে নিয়েছিলে, সেকি শুধু আমাকে বাঁচাতে, না বাড়ি থেকে আমাকে সরিয়ে পথের কাঁটা দূর করতে দিদি?'

মুখ তুলে মাধুরী বলল, 'তোর খুব ঘেন্না হচ্ছে, না?'

'ঘেন্না?' করবী আবার কোমল হয়ে এল। মাধুরীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'না দিদি, ঘেন্না না। তুমি জান না, আমার মন থেকে আজ কত বড় ভার নেমে গেল। ঘর পেলাম, সুখ পেলাম, তবু এতদিন মনে হত এসব আমার নয়, তোমার দয়ার দান। সারাজীবন শুধু কৃতজ্ঞতার বোঝা বয়ে মানুষ কতদিন বাঁচে!' একটু দম নিল করবী, ধীরে ধীরে বলল, 'আজ দেখলুম তুমিও মাটির। সঙ্গে সঙ্গে করুণা হল। তোমাকে দয়া করার সুযোগ দিয়ে আমাকে বাঁচালে দিদি। আবার হয়ত আমি পিঠ সোজা করে দাঁড়াতে পারব।'

দ্বিধা

আশ্চর্য, গলার স্বর একটু কাঁপল না করুণার। অকম্পিত কণ্ঠ। অকুণ্ঠ, সহজ ভঙ্গি। যা কিছু বলবার ছিল, সব বলে গেল। দর্শকের আসনে বসবার এতটুকু স্থান নেই। সমস্ত আদালতটা অদমনীয় কৌতূহলে এই একটা এজলাসে এসে জমেছে। স্তব্ধশ্বাস উত্তেজনা, দেখছে করুণাকে, শুনছে তার জবানবন্দী। বাইরের বটতলায় যারা ভীড় জমায়, পানবিড়ি ফিরি করে, ডেমিকাগজে কোর্ট-ফী এঁটে দরখাস্তের মুসাবিদা করে, তারাও যেন আজকের এই মুহূর্তে নীরব হয়ে গেছে। সেই দর্শকের ভীড়ে আমিও। সবার সঙ্গে আমিও করুণাকে লক্ষ্য করছি। এর আগে আরো কতবার দেখেছি করুণাকে। বিভিন্ন বেশে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন বয়সে। ষোলয় দেখেছি, কুড়িতে দেখেছি, আবার ছাব্বিশেও। ওর বয়ঃসন্ধিকালের চোখ দুটির চঞ্চলতা আমাকেও চঞ্চল করেছে, সে কথা অন্তত আজ, এতদিন পরে ওকে নিয়ে গল্প লিখতে বসে, আর গোপন করব না। ওর যৌবনের পূর্ণতাও দেখেছি। বিবাহবাসরের লজ্জারুণ মুখচ্ছবিও মনে আছে। আবার অনেকদিন পরে দেখেছি এই শহরে ; ঈষৎ স্থূলতরা, কিন্তু সেও অপরূপ।

কিন্তু, আজকের করুণার সঙ্গে কিসের তুলনা। ব্যারিস্টার সেনসাহেব, আসামী পক্ষের কৌঁশুলি, যাঁর জেরার মুখে কতো পেশাদার সাক্ষী জেরবার হয়ে যায়, তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছে। নিঃসঙ্কোচ মুখখানা অর্ধগুণ্ঠিত। একটি কথাও

বেরুলো না, যা আসামীর অনুকূলে যেতে পারে। মাঝে মাঝে আসামীর কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে যাচ্ছে। সেখানে মাথা নিচু করে সেই লোকটা বসে। ছোট করে ছাঁটা চুলের নিচে বলির পশুর মতো ক্লিষ্ট ভয়ার্ত দৃষ্টি। দীর্ঘ, অসংস্কৃত দাড়িতে চিবুক আকীর্ণ।

করুণা আজ দনুজদলনী। অলৌকিক ক্ষমতা থাকলে দৃষ্টিতেই বুঝি ভস্ম করে দিতো ওই কীটাণুকীটটাকে।

আসামীপক্ষের কৌঁশুলি এবার কালো ফিতে বাঁধা মনোকূল খুলেছেন। শাদা চোখে এই আশ্চর্য মেয়েটিকে একবার দেখে নেবেন। কে এই মেয়েটি, বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো কেলেঙ্কারির ওপর কলঙ্ককে পরোয়া করে না। এমন কি এই প্রকাশ্য আদালতে চলে আসতেও যে পেছপা হয়নি। তাঁর নিশিতক্ষুর জেরা যার ব্যক্তিত্বের বর্মে ঠেকে ভোঁতা হয়ে ফিরে এসেছে।

চশমার কাচ পরিষ্কার করে সেনসাহেব আবার চোখে লাগালেন। আর রেহাই নেই। এতক্ষণ যদি বা ভদ্রমহিলার প্রতি সম্ভ্রমবশত একটু রেখে ঢেকে প্রশ্ন করছিলেন, এবারে একেবারে নিরাবরণ জিজ্ঞাসা।

এক একটি প্রশ্ন হয়, সমস্ত এজলাসটায় গুঞ্জন ওঠে। এ যেন বড়ো বেআব্রু কাণ্ডকারখানা। কৌরবদের দ্যূতসভার মতো। শত হলেও করুণা এনজিনিয়ার সাহেবের স্ত্রী, অতুল তার সম্মান, অশেষ প্রতিপত্তি। হাকিমও যেন একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বোঝা গেল তিনিও অস্বস্তি বোধ করছেন। ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁশুলি বাধা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ইঙ্গিতে করুণা তাঁকে বারণ করল।

প্রতিটি শব্দাংশের ওপর জোর দিয়ে দিয়ে সে আগাগোড়া ঘটনাটা বলে গেল।

সেই ঝড় জলের রাত্রির কথা। সেদিন সুপ্রকাশ বাড়িতে ছিল না। অজ্ঞাত ঐ লোকটা (সনাক্ত করণ) এসে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিল।

—তখন রাত কটা?

—বারোটা।

—আপনি শুয়ে পড়েছিলেন?

—না।

—কী করছিলেন, অতো রাত্রে?

—ছবি আঁকছিলুম।

—ঝড় জলের রাত্রে ছবি?

—দুর্যোগের ছবিটাই নানা রঙের তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর ধরে রাখতে চেষ্টা করছিলুম।

—তখন এই লোকটা এল?

—হ্যাঁ।

—নিজে থেকেই এল?

—হ্যাঁ।

—আপনি ঠিক জানেন আপনি ডেকে আনেননি? হ্যাঁ কিম্বা না বলুন।

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে করুণা যথাযথ জবাব দিয়ে গেল। মুখস্ত ভূমিকা আবৃত্তির মতো। কিসের পর কী ঘটল। লোকটার আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল কখন। যখন বুঝতে পারল, তখন কি চেঁচিয়েছিল করুণা? লোকটা সশস্ত্র ছিল, না নিরস্ত্র। করুণার কাছে সে কতখানি বাধা পেয়েছিল, কিম্বা আদৌ পেয়েছিল কিনা। সুপ্রকাশ কখন ফিরেছিল। ফিরে কি করুণাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল।

—করেছিল।

—পারল না কেন?

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে করুণা একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, ওই লোকটাই বন্ধ করে দিয়েছিল। তাইতেই ওঁর ঢুকতে কিছু দেরি হয়ে যায়। দরজা ভেঙ্গে উনি যখন ঢুকলেন তখন···তখন···(করুণা একটু ইতস্তত করল)···সব শেষ হয়ে গেছে।

এইখানে এক মিনিট এজলাসটা নিস্তব্ধ রইলো। একটু পরে সেন সাহেব আবার শুরু করলেন,

—লোকটা পালাতে চেষ্টা করল না কেন?

—করেছিল, পারেনি।

—আপনার স্বামী ঘরে ঢুকতে কী হ'ল?

এক মুহূর্ত চোখ চাওয়াচাউয়ি হ'ল দু'জনের। সুপ্রকাশই বুঝি আক্রমণ করলে প্রথমে। লোকটার গায়েও শক্তি ছিল, হাতে ছিল ছুরি। কাঁধের কাছে বসিয়ে দিল সুপ্রকাশের। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সুপ্রকাশই জয়ী হল।

কোথাও এতটুকু ভুলচুক হ'ল না। একটা বেফাঁস কথা বেরুলো না। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সেনসাহেব বসে পড়লেন।—আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই।

ডাক্তারের রিপোর্ট অনুকূল ছিল। সুপ্রকাশ এবং আরো দু'চারজন সাক্ষীর জেরা ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে। ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁশুলি সংক্ষেপেই তাঁর সওয়াল সারলেন।

বললেন, সহজ, সরল মামলা। জটিলতা কিছু নেই। পদলেহী, লোলুপ একটা জীব পাশবিক কামনার বশে চরম অপরাধ করেছে। আতিথ্যের অবমাননা করেছে। ওর অপরাধ সমগ্র নারীজাতির বিরুদ্ধে,

সমাজের বিরুদ্ধে, মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে। সাক্ষ্য প্রমাণেরও কিছু অভাব নেই। অতএব, ধর্মাবতার, আসামীর আইননির্দিষ্ট চূড়ান্ত শাস্তি হোক।

সুপ্রকাশের সঙ্গে গিয়ে করুণা গাড়িতে উঠলো। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। কিছু জরুরি কাজ ছিল। টিউটোরিয়ালের খাতা দেখা আজ রাত্রেই শেষ করা চাই। কিন্তু কাজে মন বসছিল না। ঘুরে ফিরে কেবল করুণাকেই মনে পড়ছে।

করুণাকে কি আমি চিনেছি? মানুষকে কি চেনা যায়? নাকি, এ এ শুধু খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সার বস্তুর সন্ধানের অসার পরিশ্রম। বছর দশেক আগে কলকাতায় যাকে দেখেছিলাম এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে করুণা। আজকের করুণাও করুণা। কিন্তু আজকের সমতল প্রবাহিনীর সঙ্গে কতটুকু মিল আছে গঙ্গোত্রীর নির্ঝরধারার।

কিন্তু আবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। এ গল্প আমাকে নিয়ে নয়, করুণাকে নিয়ে। কবে, জীবনের পূর্বাহ্নে, ছাত্রজীবনে তাকে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি, আজ সেকথা অপ্রাসঙ্গিক। ক্লাসে ভালো ছেলে ছিলুম, করুণার বাবা অধ্যাপক চক্রবর্তী পরীক্ষার খাতায় সব চেয়ে উঁচু নম্বর দিতেন আমাকেই, বাড়িতে ডেকে নিয়ে নিজস্ব নোট দিতেন, তাই থেকে, উদ্বাহু আমি, মনে করেছিলাম তাঁর কন্যাটিকেও আমারি হাতে দেবেন।

মাস্টার মশাইয়ের দেওয়া নোট বাড়িতে এনেছি টুকে নেবো বলে, কিন্তু লিখেছি কবিতা। সেই কবিতা দু'চারটে ছাপাও হত, এমন সব কাগজে যারা কাব্যলক্ষ্মীকে দিয়ে প্রবন্ধ গল্পের পদসেবা করায়। দুরু দুরু বুকে সেগুলো নিয়ে গেছি করুণার কাছে, ঠেকে-ঠেকে যাওয়া গলায় পড়ে শুনিয়েছি। তার অল্প-বলা এবং বেশিটাই না-বলা প্রশংসায় দুঃশাসন আবেগ বেবল্‌গা হয়েছে কখনো। করুণাকে কামনা করাটা তেমন দুঃসাহস মনে হয়নি।

কিন্তু তখনো আসেনি সুপ্রকাশ সোম। এলো বিলেত থেকে দিশী ডিগ্রীটার ওপরে বিলিতি বার্নিশ লাগিয়ে। স্বদেশে শেখা ইংরিজিকে বিলিতি উচ্চারণে, শুদ্ধতর না হোক, উগ্রতর করে। এলো, আর যেন জয় করে নিলো। বহির্বিশ্বদেখা চোখের দ্যুতিতে করুণাকে ঝলসে দিলো। কলকব্জার সর্বরহস্য-পারঙ্গম হয়ে এসেছে, সরকারী পূর্ত বিভাগে দু'-হাজারি চাকরি তো ওর জন্যে নির্ধারিত। আর আমি, আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, দু'চারটে কবিতা লিখি, করুণাকে পড়ে শোনাই। সুপ্রকাশেতে আর আমাতে?

তবু একবার মূঢ়তাবশত মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। বরাবরের মতো নোট্‌প্রার্থী হয়ে নয়, তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে।

খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। বুঝেছি, তোমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে, ধীরে ধীরে বললেন। মন দিয়ে পড়ো। তোমার ওপর আমার অনেক আশা। সব ছেলের নামের উপর তোমার নাম ছাপা হওয়া চাই।

ছাপা হ'লও তাই। কিন্তু কিছু সুবিধে হ'ল না। অনেক দরখাস্ত লেখালেখির পর চাকরি একটা জুটলো এখানে, এই মফঃস্বল কলেজে, অধ্যাপনার; যার মূল্য মাসান্তের দেড়শোটি টাকায় নির্দিষ্ট। সেই দেড়শো টাকা এই ক'বছরে কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির সিঁড়ি বেয়ে পৌঁচেছে পৌনে দু'শোয়; সেই সঙ্গে ছাত্র পড়ানোর পঁয়ত্রিশ টাকা যোগ দিলে যা দাঁড়ায় তাতে মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে কিছু বই কিনে আনা চলে। মাস তিনেক তারই চর্বিতচর্বন করে কাটে। তারপর আবার যাই।

বেশ সহজ হয়ে এসেছিল এই জীবন। কিন্তু আবার এলো করুণা। সুপ্রকাশ এখন সাফল্যের শিখরাসীন। পি, ডব্লিউ, ডি'র ডিস্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ার। ওজন কিছু বেড়েছে। টেনিস এখনো খেলে বটে, কিন্তু আগেকার মতো স্বচ্ছন্দে নয়। ঘোড়ার চেয়ে মোটরে চড়ে আরাম

পায় বেশি, বনে বনে শিকারের সন্ধানে ছুটোছুটির চেয়ে, ঝিলের পাশে ফ্লাস্‌কভর্তি চা নিয়ে মাছ ধরায়।

নতুন শহরে এসে ওরা দুদিনেই সকলকে আপন করে নিয়েছিল। টাউন ক্লাবে মোটা রকমের চাঁদা দিয়ে সুপ্রকাশ পৃষ্ঠপোষক হ'ল। হাইস্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় ছাত্রদের হাতে হাতে বই তুলে দেবার একচেটে ভার নিলে করুণা।

প্রায়ই ওদের বাংলোয় কোন না কোন উৎসবের আয়োজন থাকে। জন্মতিথি, বিবাহবার্ষিকী কিংবা বর্ষামঙ্গল। আমাকে এখানে দেখে খুশি হ'ল।

—তবু যাহোক্ একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম এখানে।

কথাটা বাজে। কেন না, আমি জানতাম অপরিচিতকে পরিচিত করে নিতে করুণার বেশি দেরি হয় না। তাছাড়া যে কোন পুরনো, পরিচিত মুখ পেলেই করুণার কি ভালো লাগ্‌ত। সে কথা সাহস করে জিজ্ঞাসা করিনি।

শহরের মেয়েদের নিয়ে করুণা একটা সমিতি গড়ে তুললো। শিল্প-কেন্দ্র খুললো একটা। ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে "পূজারিণী" মঞ্চস্থ করল একবার। নিজে নাচেনি, কিন্তু শিখিয়েছে নিজেই। সারাক্ষণ স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে সূত্রধারের কাজ করল। বহুদিন পরে সেই আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অভিনয়শেষে সবার অনুরোধে গানও গাইল একটা। 'মনে হয় যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ, আসিতে তোমার দ্বারে।'

করুণার সঙ্গে সঙ্গে এই নীরস শহরের যেন রঙ বদলেছে, এসেছে বৈচিত্র্য। সংস্কৃতির খিড়কির ঘাটেও ঢেউ উঠেছে। সকলের মুখে কেবল করুণাদি কিম্বা মিসেস সোম।

অভিনয়শেষে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন লাগল। বললাম, চমৎকার।

—কবিতা লেখোনা আজকাল?

এখনো মনে রেখেছে, এতেই কৃতার্থ বোধ করলাম। একান্তে হ'লে হয়ত যোগ করে দিতাম, 'প্রয়োজন ফুরিয়েছে।' লোকের ভীড়ে সে কথা বলা চলে না। শুধু বললাম, না।

—লেখো না, করুণা বললে, নৃত্যনাট্য লেখো একটা। আমি প্রযোজনা করব।

অর্থাৎ আমি রূপ দেবো, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে সে।

পুরনো লোভটা একবার লকলক করে উঠলো, তাকে নিরস্ত করলাম। আমি তো জানি করুণার জীবনের সবটাই সুপ্রকাশ জুড়ে আছে। শালপ্রাংশু মহাভুজ সুপ্রকাশ। কৃতিত্বে পুরুষোত্তম। ওরা দু'জনে একসঙ্গে ড্রাইভ করে বিশ মাইল দূরে ফল্‌স্‌ দেখতে যায়, একসঙ্গে মার্কেটিং করে, বাড়িতে সারাক্ষণ একসঙ্গে বাগানের ফুল-ফল নিয়ে আলোচনা করে; বই পড়ে, গ্রামোফোন বাজায় কিম্বা গান শোনায়। এক আর একে ওরা দুই। এর মধ্যে মাঝে মাঝে বাইরের দু'চারজনকে ডাকে বটে, কিন্তু সে ওদেরি আনন্দের অংশ দিতে। ও বাড়িতে আহূতের স্থান শুধু দর্শক হিসেবে, কোন ভূমিকা তারা পায় না।

কিন্তু তবু পরদিন সকালে করুণাদের ওখানে গেলাম। অত্যন্ত ঢিলেঢালা একটা পোষাক, যার ইংরিজি নাম ড্রেসিং গাউন, পরে সুপ্রকাশ বাইরের ঘরে বসে আছে। সোফায় বসে চুরুট টানছে; ঈষৎ চিন্তাকুল মুখ। সে চিন্তা দুশ্চিন্তা নয়, বলাই বাহুল্য। ব্রিজ প্রবলেম ছাড়া সুপ্রকাশের জীবনে আর কোন প্রবলেম নেই, আমি জানি। হয়ত এখুনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে পার্টনারের ফোর স্পেডসের ওপর ফোর নো-ট্রাম্পস্‌ ডাকটা কী ইনডিকেট করে। লিটল স্ল্যাম, না গ্র্যাণ্ড। অবশ্য এসব কূট প্রশ্নের জবাব দেবার মতো পাণ্ডিত্য আমার

নেই। বেশি ডাকাডাকি করলে ডাউন দিতে হয়, তাস খেলার এইটুকুই মাত্র আমি জানি।

আমাকে দেখে সহর্ষ একটা ধ্বনি করে উঠল সুপ্রকাশ। এসো হে। (কী জানি কেন, সুপ্রকাশ কিছুকাল থেকে আমাকে স্বল্প পরিচয়ের 'আপনি' থেকে অতি অন্তরঙ্গতার 'তুমি'তে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।) আজ বৃষ্টি হবে কিনা বলতে পারো? হাওয়া-অফিসের জ্যোতিষীরা বলছেন হবে, করুণাও বলছে হবে। আমি বলছি হবে না। করুণার সঙ্গে ছোট একটা বেটিংও হয়ে গেছে এ নিয়ে। তুমি কী বলো।

বললাম, কিছু বলিনে, একেতো অনিশ্চিতকে নিয়ে ফাট্‌কা খেলায় অভ্যস্ত নই, আবার এই শনি-লক্ষ্মীর কলহে পক্ষগ্রহণ করলে শ্রীবৎস রাজার মতো বিপত্তির সম্ভাবনা। করুণা কোথায়?

সুপ্রকাশ বললে, তোমরা মাস্টাররা ভারি টেম্। ব্র্যাডলি শেক্সপীয়র সম্বন্ধে কী বলেছেন তার বেশি কিছু বলতে ভরসা পাওনা। ভেতরে যাও, করুণা আছে।

ঈজেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে করুণা ছবি আঁকছে। জানালার পাশে সূর্যালোককে ঈষৎ আড়াল করে কী একটা দাঁড় করানো। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রস্তরমূর্তি। পরে দেখলাম মানুষ। তামাটে, কর্কশ, কিন্তু পেশিদৃপ্ত। করুণা ইঙ্গিতে ওকে যেমন করে ঘুরে ফিরে দাঁড়াতে বলছে, তাই করছে। বিনাবাক্যে। বশ্যতার এমন কায়িক রূপ সচরাচর দেখা যায় না।

—আমাদের নতুন সহিস, করুণা বললে, ওকে আমি মডেল করে নিয়েছি। যে ছবিটা আঁকছি তার নাম দেবো "পৌরুষ"। কেমন হবে?

চমৎকার হবে, বললাম।

তুলি রেখে করুণা জিজ্ঞাসা করল, নৃত্যনাট্য লিখে এনেছ?

—এক রাত্রেই? পাগল নাকি। কিন্তু তুমি আঁকা বন্ধ করলে কেন।

—এখন আর হবে না।

করুণা ইঙ্গিতে সহিসকে চলে যেতে বলল। বললাম, কী ভীষণদর্শন লোকটা! একমাত্র কালান্তক যমের উপমাটাই মনে আসে।

করুণা বললে, নাম গুরুবক্স। দেশ মিঞাওলি, পাঞ্জাব। এক লাইন লিখতে পড়তে জানে না। ওর ভাষায় মাথামুণ্ডু কী বলে, বুঝতেও পারিনে। তবে লোকটা ঘোড়া চেনে। ওকে আমি ভিরিলিটির একটা স্পেসিমেন হিসেবে নিয়েছি। আমি নতুন ধরণের ছবি আঁকবো। কাঠিকাঠি, সরুসরু, লিকলিকে, হাত-পায়ের ছবিতে দেশ ছেয়ে গেল। আমি শক্ত মানুষ আঁকতে চাই, মোটা তুলির আঁচড়ে, চড়া রঙে।

রসিকতা করার চেষ্টা করে বললাম, রঙ তোমাকে বেশি চড়াতে হবে না। শ্রীমানের রঙ ফোটাতে খানিকটা ব্লু ব্ল্যাক কালিই যথেষ্ট।

একটু বেশি কালোই বটে, করুণা স্বীকার করল,—প্রথম যেদিন এলো সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ছবির উপাদান ওর চেয়ে ভালো পাওয়া যাবে না।

কী করে সুপ্রকাশদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জমে উঠলো, সেটা ভাবতে আমার নিজেরি অবাক লাগে। সামান্য মাস্টারি করে খাই, আমি কোথায় আর সুপ্রকাশ কোথায়, ওর অধস্তন একটা টালিক্লার্কের রোজগারও আমার চেয়ে বেশি।

গিয়ে দেখেছি, করুণা হয়ত মাফলার কি মোজা বুনছে সুপ্রকাশের জন্যে। কিম্বা নিজের হাতেই ইস্ত্রি করে রাখছে সুপ্রকাশের শার্ট, কলার, পাতলুন। হঠাৎ ঢুকে পড়াটা নিজের কাছেই কেমন নির্বোধ, অসঙ্গত বোধ হ'ত। তবু না গিয়ে পারতাম না। করুণার আছে প্রাণের

প্রাচুর্য, অপরিমিত অপব্যয়েও যা ফুরোয় না। কখনো ছবি আঁকায়, কখনো স্বগৃহে পার্টিতে, কখনো বা খেলার মাঠে ট্রফিবিতরণে, কখনো নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে, সর্বদাই কিছু না কিছু নিয়ে সে ব্যস্ত। অন্তত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সেই সতেজ প্রাণটুকুই করুণা। সেই প্রাণটুকু বহ্নিমান। সুপ্রকাশের কাছে তা হয়ত অতি প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন উত্তাপ, আমার মতো পতঙ্গের কাছে মৃত্যু।

এবারে করুণাকে পেয়েছে ছবির নেশায়। আর সব ফেলে কেবল ছবি আঁকছে তো আঁকছেই। গুরুবক্সকে নিয়েই ওর একটা সিরিজ হয়ে গেল।

আর কত আঁকবে করুণা? আর বেশি না। রূঢ় তুলির পোঁচ অনেক হ'ল। এবারে এগুলো একাডেমির আগামী প্রদর্শনীতে কলকাতায় পাঠাবে; দশজনের চোখে ওর সৃষ্টির যাচাই হবে।

গুরুবক্সকে মাঝে মাঝে দেখি, আস্তাবলের ধারে অশ্ব পরিচর্যা করছে। কালো মজবুত শরীরের ওপর ফোলাফোলা রগ, মনে হয় পাথর কুঁদে তৈরি। উজ্জ্বল চোখ দুটির দৃষ্টি হিংস্র এবং বন্য। করুণা যখন ওকে আঁকে তখন ঈষৎ মূঢ়, ঈষৎ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকে। অতি আধুনিকা এই মেয়েটির বিচিত্র খেয়ালে সায় দিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু বিস্ময় ওর শেষ হয়নি।

—তোমার মডেলের যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে করুণা। বেচারা এসেছিল ঘোড়ার তদারক করতে, পড়ে গেল আর্টিস্টের খপ্পরে। সুপ্রকাশ একদিন ঠাট্টা করে বললে।

আমি বললুম, তাছাড়া ওকে একটু ঘসে মেজে জলচল করে নাও। লোকটা যে আরণ্যকই রয়ে গেল।

থাক না, করুণা সস্নেহে বলল, পালিশকরা, এনামেলকরা মানুষ তো কত দেখলুম, ও বুনোই থাক্।

প্রচ্ছন্ন শ্লেষটা আমার প্রতি কিনা বোঝা গেল না। চুপ করে রইলাম।

প্রদর্শনী খোলার আর অল্প দিন মাত্র বাকি। কিন্তু যে সিরিজ দিয়ে করুণা রসিকচিত্ত জয় করবে, তা তখনো শেষ হল না।

কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম, করুণার মত বদলেছে। ও ছবি আর আঁকবে না।

—কেন? মডেল বিদ্রোহ করেছে?

অল্প হাসল করুণা। বিদ্রোহই বটে। কিন্তু একটু অন্য ধরনের। প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠতে চাইছে। ওর—ওর হাবভাব সে রকম সুবিধের নয়।

—আহাহা, সে তো একটু হবেই, সুপ্রকাশ বললে, সুন্দরী নারীর সংস্পর্শে বেশি আসেনি তো।

—ঠাট্টা নয়, ওর কথা তো ভালো বুঝতে পারিনে, আকার ইঙ্গিত ডিসেন্সির লিমিট ছাড়িয়ে যেতে চাইছে।

এবার সুপ্রকাশ একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

—তাই নাকি। তাহলে ওকে ছাড়িয়ে দাও। আজই।

—ছাড়াতে ঠিক বলছি না, আমার মনে হয় ওকে আর বেশি প্রশ্রয় না দিলেই হবে।

—বিশ্বশুদ্ধ লোক ওদের প্রেমে পড়েছে, অনেক মেয়ের এ রকম ভ্যানিটি থাকে বটে, সুপ্রকাশ বললে, কিন্তু তোমার যখন সামান্য সন্দেহও হয়েছে, তখন আর ওকে রাখা চলে না।

সুপ্রকাশ একবার যা ঠিক করে তা আর সহজে বদলায় না। আমার সামনেই ডেকে পাঠালো গুরুবক্সকে। সেলাম করে লোকটা এসে দাঁড়ালো। মাথায় চৌকাঠ-ঠেকানো চেহারা। পাথুরে রঙে আলো

ঠিকরে ফিরে আসছে। পেশির খাঁজে খাঁজে করোগেট টিনের দৃঢ়তা। অনুচ্চ নাক আর পুরু ঠোঁটের ওপর চকচকে দুটি চোখ। সুপ্রকাশ তাকে যখন ঘোড়ার তদারক সন্তোষজনক রকমের হচ্ছে না বলে বরখাস্ত করলে, সেই চোখ দুটিতে যেন চকমকি পাথর ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো। একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখলো করুণার মুখের ওপর। করুণাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল না, সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

একমাসের আগাম মাইনে দিল সুপ্রকাশ, গুরুবক্স তা ছুঁলো না। আরেকটা সেলাম ঠুকে য়্যাবাউট টার্ন করে ঘর থেকে জোরে জোরে পা ফেলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। শানবাঁধানো বারান্দায় ওর নালপরানো জুতোর আওয়াজ অনেক দূর থেকেও শোনা গেল।

সুপ্রকাশ বললে, এসো তিনহাত ব্রিজ খেলা যাক্। কাট্ থোট্। একটাকা পয়েন্ট।

করুণা বললে, আজ থাক। আমারো উৎসাহ ছিল না। গুরুবক্সের জন্যে বিচিত্র ধরণের সহানুভূতি বোধ করছিলাম। করুণার সন্দেহও যদি সত্যি হয়, তবে যে আগুনে আমি একদিন পাখা পুড়িয়েছি সেই আগুনে আজ ওর পাখাও পুড়লো।

সুপ্রকাশের অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই। করুণাকে সে সম্পূর্ণভাবে দখল করে আছে। হস্তচ্যুত হবার কোন আশঙ্কা নেই জেনেই আমাকে এ গৃহে অবারণ প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এটা হয়ত আমার পৌরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা, হয়ত করুণার ওপর গভীর বিশ্বাস।

কিন্তু দু'দিন পরে যা ঘটল, তাতে সুপ্রকাশের মতো আত্মবিশ্বাসী লোকও আপ্‌সেট হ'ল। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা এ শহরে কখনো ঘটেনি।

দুপুর বেলা থেকেই সেদিন শুরু হয়ে গেল কাঁথামুড়ি বৃষ্টি, প্রথমে

ঝির ঝিরে, তার পর জোরে জোরে হাওয়া বইতে শুরু করলে। বিকেল থেকে ঝড়। আর এরই মধ্যে সুপ্রকাশকে বেরুতে হল টুরে। সেদিন ফেরবার কথা ছিল না কিন্তু এখান থেকে দশমাইল দূরে খেয়া পার হবার যে স্টিমার স্টেশন, সেখানে গিয়ে শুনল দুর্যোগের জন্যে আজ রাত্রে ফেরী বন্ধ। ফেরবার শেষ গাড়ি তখনো ছিল। শহরে যখন ফিরে এল তখন মধ্য রাত্রি। তখনো বইছে শন শন হাওয়া, বিদ্যুতের নির্লজ্জ আলোয় আকাশ নিরাবরণ হয়ে পড়ছে।

বাংলো অন্ধকার। শোবার ঘর বন্ধ। ধীরে ধীরে করক্ষেপ করল। তারপর অসহিষ্ণু হাতে। ক্রমশ জোরে, আরো জোরে। জলের ঝাপটায় সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। করুণার সাড়া নেই কেন। দু'একবার লাথি মারল দরজায়। শেষের বার মরীয়া হয়ে। কপাটের কবজা আলগা হয়ে খুলে পড়ল।

কী দেখল ভেতরে। তার বর্ণনা আদালতে দিতে গিয়ে সুপ্রকাশ তিনবার জল চেয়ে খেয়েছিল। বলতে গিয়ে গলা শুকিয়ে আসে, সব কেমন ঝাপসা হয়ে যায়। একটা ধস্তাধস্তি হয়েছিল মনে আছে। ছোরার আঘাতের শুকনো ক্ষত আছে বাহুমূলে। আর মনে আছে ধবধবে চাদরের ওপর এলানো করুণাকে; শাদা মেঘের ওপর শয়ান, বিকালের নিস্তরঙ্গ, নিষ্প্রভ আলোর মতো।

সুপ্রকাশের ইচ্ছে ছিল না এ নিয়ে মামলা হয়। উঁচুদরের সরকারি কর্মচারী, স্ক্যাণ্ডালকে তার বড়ো ভয়! কিন্তু তবু কী করে শহরময় ঢি-ঢি পড়ে গেল। চাকরবাকরেরা ধস্তাধস্তির সময় ছুটে এসেছিল বুঝি। তারাই হয়তো রটিয়েছে। বাহুমূলের ক্ষতটার জন্যেও ডাক্তারকে কোন বিশ্বাস্য কৈফিয়ৎ দেওয়া গেল না।

ব্রণভোজী মক্ষিকাদের গুঞ্জন উঠলো শহরময়। এমন মুখরোচক ব্যাপার কিছু রোজ রোজ ঘটে না। এর আগে নিচু শ্রেণীর মধ্যে কখনো

এই ধরণের বিশ্রী ব্যাপার শোনা গেছে বটে, কিন্তু বড়ো ঘরের কেচ্ছার মতো মজার কিছু নেই দুনিয়াতে। করুণার কোন দোষ নেই বটে। কিন্তু কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি-ই।

শেষ পর্যন্ত সুপ্রকাশও মত দিলে। জানাজানি যখন হ'লই, তখন চূড়ান্ত হোক।

গুরুবক্সকে পাওয়া গেল অনেক দূরের একটা জংশনে। সেখানে নাকি গাঢাকা দিয়েছিল।

সব চেয়ে বিস্ময় বোধ করলাম করুণার আচরণে। প্রথম কদিন একটু মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু সময় যখন এলো, তখন ওর রূপ দেখে অবাক্ লাগল। পুলিশের কাছে যখন জবানবন্দী দিল, তখন ওর চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ঝরছে। ডাক্তারের পরীক্ষার প্রস্তাবও মেনে নিলে। প্রতিহিংসার ব্রত নিয়েছে করুণা। যে তার সম্মান থেঁৎলে দিয়েছে, তাকে মরণ-দংশন না করে ওর স্বস্তি নেই। দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধনের প্রতিজ্ঞার মতো।

হাকিম করুণাকে প্রকাশ্য আদালতে জেরা করতে চাননি। ওঁর খাসকামরার আব্রুর সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। করুণা বললে, তার প্রয়োজন নেই। সবার সম্মুখেই তার অগ্নিপরীক্ষা হোক।

রায় বেরুলো। দশ বছরের কঠোর কারাদণ্ড। সুপ্রকাশকে ছুরিকাঘাত, সেজন্যে আরো এক বছর। হাকিম আক্ষেপ করেছেন, যথেষ্ট সাজা দেবার এক্তিয়ার নেই তাঁর। তাঁর নিজেরি হাতে আইনের হাতকড়ি। নইলে এই অপরাধে চরমতম দণ্ড দিতেও তিনি ইতস্তত করতেন না। গুরুবক্সের মতো ঘৃণ্য জীবেরা সমাজের গলিত ক্ষত। কুকুরের সঙ্গে তুলনা করবেন না তিনি, কেন না কুকুরেরও প্রভুভক্তি আছে, কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। প্রসঙ্গত করুণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এই মহিলা যে রকম সপ্রতিভ কুণ্ঠাহীনতায় আপন

দুর্ভাগ্যের কথা বিবৃত করেছেন, তাতে তাঁর পক্ষে ন্যায় বিচার প্রয়োগ করাও সহজ হয়েছে, সন্দেহ নেই। কেন না, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের অতি সংকোচ অনেক সময় সত্যাসত্য নির্ধারণে বাধা দেয়।

সেদিন বাসায় ফিরে ছোট্ট একটু চিরকুট পেলাম। অতিপরিচিত গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা : "আগামী কাল-সন্ধ্যায় ছোট একটি প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করেছি। নিশ্চয় আসা চাই। উনি লম্বা ছুটি নিয়েছেন। তার মানেই এখান থেকে বদ্‌লি।" নিচে করুণার নাম সই।

আমি জানতাম সুপ্রকাশ ছুটি নেবে, এখান থেকে পালাতে চাইবে। ওর নার্ভের ওপর দিয়ে সোজা ঝড় তো বয়ে যায়নি।

চিরকুটটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একবার কলেজের লাইব্রেরীতে যেতে হবে। পথে সিনিয়ার উকিল ভূদেববাবুর বাড়ি পড়ে। গুরুবক্সের কৌঁশুলি সেন সাহেব এখানেই উঠেছেন। ভূদেববাবু বুঝি তাঁর সতীর্থ ছিলেন।

বারান্দায় ইজিচেয়ার বিছিয়ে সেন সাহেব পাইপ টানতে টানতে ভূদেববাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে ভূদেববাবু ডাকলেন, আসুন মাস্টারমশাই, আসুন। চা খেয়ে যান।

সেন সাহেবকে নমস্কার করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

আপনি এখনো যাননি ?

সেন সাহেব বললেন, আজ সন্ধ্যার গাড়িতে যাবো। একটু থেমে হেসে বললেন, এ কেসটা কিন্তু বেজায় হেরে গেলুম মশাই। বাপ্‌রে বাপ, কী মেয়েমানুষ ! কী স্পিরিটেড্ আর কনসিস্‌টেন্ট, একটা এলোমেলো কথা বার করতে পারলুম না ?

ভূদেববাবু বললেন, ওঁরা হলেন সতীলক্ষ্মী। উকিল ব্যারিস্টারের জেরা ওঁদের কিছু করতে পারে না।

ইন্দ্রবল্লভ সেন্ সাহেব সামান্য একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, তা হবে। দেখি হাইকোর্টে কী হয়।

হাইকোর্টেও আপীল করবেন নাকি ? কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম। গুরুবক্স চালাতে পারবে এত খরচ ?

সেন সাহেব দার্শনিকের মতো হেসে বললেন, চালাতে কাউকে হয়না মশাই, ভগবান চালান। কী একটু রহস্য আছে যেন সেন সাহেবের মুখের ভঙ্গিতে। এ শহরে গুরুবক্সের খালি শত্রুই আছে ভাববেন না ; শুভানুধ্যায়ীও আছে। নিচের আদালতের খরচ তারাই আমাকে পাঠিয়েছিল। আবার, গলার স্বর খাটো করে সেন সাহেব বললেন, আজ কোর্ট থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠতে যাচ্ছি, দেখি সীটের ওপর আমার নাম লেখা একটা চিঠি। এই দেখুন—

চিঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথা : "হাইকোর্টে প্রাণপণ লড়বেন। খরচের জন্যে ভাববেন না। যথাসময়ে কলকাতার ঠিকানায় খরচ যাবে।" নিচে স্বাক্ষর নেই।

চিরকুটটার হস্তাক্ষর দেখে চম্‌কে উঠলুম। কল্‌জেয় হাতুড়ি পড়ল। স্বাক্ষর না থাকুক, এ লেখা আমি চিনি। ইচ্ছাকৃত বিকৃতির চেষ্টা সত্ত্বেও আরেকটি হাতের লেখার সঙ্গে এর হুবহু সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে, যে হাতের আরেকটা চিরকুট আমার বুক পকেটে খস্‌খস্ করছে।

অবিশ্বাস্য আবিষ্কৃতির উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে এসেছিল। কোন রকমে ভূদেববাবু আর সেন সাহেবকে নমস্কার করে কতকটা খাপছাড়া ভাবেই চলে এলাম।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সুপ্রকাশের বাংলোয় গিয়েছিলাম। সুপ্রকাশ বললে, এসো। ছুটি নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তাই বন্ধুবান্ধব দু'চারজনকে ডেকেছি। অবশ্য, সুপ্রকাশ একটু থেমে বললে, রাহুমুক্তিও অন্যতম কারণ বটে।

করুণাকে দেখলাম। আগুন রঙের একটা শাড়ি ওর দীর্ঘ দেহ জড়িয়ে জ্বলছে। সুসজ্জিতা ওকে অনেক দেখেছি, কিন্তু আজকের মতো এমন অনির্বচনীয় সাজে কখনো নয়।

অমায়িক হেসে সকলকে আপ্যায়ন করছে করুণা। চা ঢেলে দিয়ে কারুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট কথা বলে, কাউকে মিষ্টি একটু হাসি দিয়ে, কাউকে বা হালকা কোন কথায় হাসিয়ে।

লোকের ভীড়ে বসবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না। নির্জন একটা কোণ বেছে নিয়েছিলাম। সেখানে করুণা এলো।

—আরে, তুমি যে! কতক্ষণ এসেছ?

বললাম, এই কিছুক্ষণ হ'ল।

একটা চেয়ার টেনে করুণাও বসল। কয়েকদিন আসনি কেন?

বললাম, ব্যস্ত ছিলাম। সেদিন আদালতে গিয়েছিলাম। তোমার জেরা হ'ল, শুনলাম। চমৎকার উৎরেছ কিন্তু। তুমি অতটা স্টেডি ছিলে বলেই লোকটার অত সহজে কন্‌ভিক্‌শন হয়ে গেল।

চোখ দু'টো একবার জ্বলে উঠলো করুণার। ঘৃণার সাপ ফণা তুললে যেন: কী আর কন্‌ভিক্‌শন হ'ল; ওর ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

এক দিন আগে হলেও এ কথায় বিগলিত হয়ে যেতাম। কিন্তু দু'টো হস্তাক্ষরের আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা তখনো মনে ছিল। নিজেই একটু হাসলাম। কী একটা রোখ্ চাপল মনে। বললাম, কাল বিকেলে সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল করুণা। বললেন, হাইকোর্টে গিয়ে ফার্স্ট রাউণ্ডে ঘায়েল হবার শোধ নেবেন।

করুণা হঠাৎ যেন নিভে গেল। আঁচলের একটা প্রান্ত অনামিকায় জড়াতে জড়াতে নিস্পৃহ গলায় বলল, তাই নাকি।

কী এক সর্বনাশা দুর্বুদ্ধিই তখন খেলছে মাথায়। এই মেয়েটি, যে চিরকাল আমাকে তুচ্ছ করে এসেছে, আজ তাকে নির্মম আঘাত করবার লোভ যেন পেয়ে বসেছে।

খুব গোপনীয় কথা বলার গলায় বললাম, আপীলের খরচ কে দিচ্ছে জানো? শুনে আশ্চর্য হবে, এখানকারই একজন। তার হাতের লেখাও দেখে এসেছি।

যে মুখ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে, নিপুণ প্রসাধনে জ্বলছিল, পলকে সেটা ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেল। ঈষৎ আতঙ্ক ফুটে উঠলো কপালে। দু'এক ফোঁটা ঘামও দেখা গেল।

কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই চরম মনোবল প্রয়োগ করে সহজ, স্বাভাবিক হয়ে গেল করুণা। আরো কাছে ঘেঁষে এলো আমার। মিষ্টি হেসে বলল, ওসব কথা যেতে দাও। এখন কী খাবে বলো। তর্জনী দিয়ে আমার কনুইয়ে একটা অযাচিত চাপ দিয়ে বলল, কী নেবে? স্যাণ্ডুইচ? পেসট্রি?

স্পর্শের উৎকোচে বশীভূত হবার মনোভাব নিয়ে সেদিন আসিনি। কঠিন চোখে ওকে দেখছিলাম। সেই চাউনির সামনে করুণা যেন কুঁকড়ে গেল। শুকনো গলায় কোনমতে বলল, এ নিয়ে এত 'ফাস্' করছ কেন?

ওর কম্পিত বুকের ওঠাপড়ার নিচে স্পষ্টতই একটা ভীত সত্তা লুকানো আছে। সেই এক পলকে যেন আরেক করুণাকে দেখতে পেলাম, যে মিসেস সোম নয়, অরণ্যসুখাস্বাদের জন্যে যার অলক্ষ্য সত্তা উন্মুখ। একটা সন্দেহের ছুরি বিদ্যুতের মতো আমার মনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঝলসে দিয়ে গেল। আজ মামলা জিতে উৎসব করছে করুণা, কিন্তু সেদিন, সেই ঝড়-জলের রাতে, সুপ্রকাশ যদি অতর্কিতে এসে না পড়ত তা হলে কি এই মামলা আদৌ হ'ত?

করুণা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নুয়ে পড়ে আমার পেয়ালায় চা ঢেলে চিনি মিশিয়ে দিলে। আর আমার দিকে তাকালে আড়চোখে। সে দৃষ্টিতে অনুনয়ের নিচে ঘৃণার আগুন আছে চাপা। যদি এটা এমন সাজানো গোছানো ড্রইংরুম না হ'ত, বুঝি ফুলদানী বা টীপট্‌টাই আমাকে ছুঁড়ে মারত করুণা।

অপাঙ্গে তাকিয়ে একটু হেসে, কনুইয়ের ওপর আরেকটু চাপ দিয়ে করুণা উঠে গেল।

রেলওয়ের পার্শি এস, ডি, ও সস্ত্রীক এসেছেন। তাকিয়ে দেখলাম, করুণা তাঁদের অভ্যর্থনা করছে। পরম হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলছে—হাউ গ্ল্যাড টু—

মনে মনে কৌতুক বোধ করলাম। এর একটু পরেই সবার অনুরোধে করুণাকে পিয়ানোর ডালা খুলে গান গাইতে হবে, তাও অনুমান করতে পারি। এ করুণাও করুণা।

শনি

বাব্‌রী চুলের নিচে কামানো ঘাড়, পাউডারের ছোপ, ডানধারে বোতামওয়ালা পাঞ্জাবির তিনটে বোতামই খোলা। গোঁফের অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগে কী একটা কুটিল সংকল্পের ইঙ্গিত।

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বিনুনী করছিল, আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, কপালে এরি মধ্যে ক'ফোঁটা ঘাম জমেছে। আবার একটু ক্রীম ঘষতে হ'ল।

তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে যমুনা নেমে এল নিচে। যদি নিরস্ত করতে পারে; আলের ওপর শুয়ে পড়েও ঠেকাতে পারে সর্বনাশের বেনোজল।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই লোকটা ঢুকে পড়েছে। কপাটটা ভেতর থেকে দিয়েছে ভেজিয়ে।

দরজার বাইরে ধুলোয় থপ করে বসে পড়ল যমুনা। মেয়াদ তো ফুরিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেক পর এ ধুলোটুকুর ওপরও আর কোন অধিকার থাকবে না। নরেশ যখন সব জানতে পারবে। যেমন আছে, এই পোষাকেই মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে হবে, হয়ত ঐ লোকটার সঙ্গেই, কালাপাহাড়ি নিষ্ঠুরতা নিয়ে আজ যে হানা দিয়েছে। বিষশ্বাস বাসুকি উঠে এসেছে পাতালের নিমন্ত্রণ নিয়ে।

দরজার ওপর কান পাতলো যমুনা। বন্ধ ঘরের কথাবার্তা, কিছু বোঝবার উপায় নেই। কেবল ফিস ফিস শব্দে একটা হীন চক্রান্তের ইঙ্গিত।

লোকটা যা বলবার সব বলেছে সন্দেহ নেই। ওর সাপুড়ের ঝাঁপি খুলেছে। যমুনার জীবনে একটিমাত্র মিথ্যা, একটিমাত্র প্রবঞ্চনা ফুল হয়ে উঠেছিল, তার এক-একটি পাপ্‌ড়ি খুলছে।

যমুনার লোভ হ'ল, একবার শোনে উত্তরে কী বলছে নরেশ। সে কি বিশ্বাস করেছে? বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী। লোকটা এত তোড়জোড় করে যখন এসেছে, তখন কি আর উপযুক্ত প্রমাণ-দলিল না নিয়েই এসেছে।

দু'একবার মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল নরেশের। কথাগুলো যমুনা বুঝতে পারলো না, কিন্তু স্পষ্ট যেন দেখতে পেল, অপ্রত্যাশিত, মর্মান্তিক সত্যের আঁচ লেগে চোখ-মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কঠিন আঙ্গুলের শিরাগুলো উঁচু হয়ে উঠেছে, চেয়ারের হাতল শক্ত মুঠিতে ধরে মাথা নিচু করে বসে আছে। পানপাত্র একবার নিঃশেষ করে লোকে যেমন শূন্যপাত্র এগিয়ে দিয়ে আবার ভরে দেবার নির্দেশ দেয়, তেমনি ভাবে একটু একটু শুনছে নরেশ, ওর মাথাটা বুঝি একটু একটু টলছে; বলছে, তারপর, তারপর।

যমুনা জানে তারপর কী। ঐ লোকটা বেরিয়ে যেতেই নরেশ উঠে আসবে টলতে টলতে। রাগে, ঘৃণায় আরক্ত চোখে তাকাবে যমুনার দিকে। তারপর? লাথি মারবে, না চুলের ঝুঁটি ধরবে? নাকি গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে সদরে?

দিক। যমুনাও শক্ত করে বেঁধেছে মন। দু'দিনের স্বর্গসুখ যদি ঘুচেই যায়, যাক তবে। আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালো যমুনা। অল্প অল্প পা টলছে। তবু রেলিং ধরে অনায়াসেই উঠতে পারলো ওপরে।

টেবিলের ওপর বিকেলে তুলে আনা ফুলগুলি এখনো অম্লান। বিছানার ওপর নতুন ভাঁজভাঙা চাদরটা পরিপাটি। সমস্ত মুখটা

তেতো হয়ে গিয়ে একটা কান্না এলো যমুনার। এ বিছানায় আর কোনদিন শোওয়া হবে না। ফুলতোলা বালিশের মসৃণ ওয়ারগুলোর ওপর যমুনা একবার হাত বুলিয়ে নিলে; ভিজে-ওঠা কপোল বালিশের ঈষদুষ্ণ কোমলতার মধ্যে ডুবিয়ে চোখ বুঁজে রইল খানিকক্ষণ। এ স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, থাকনা।

কিন্তু একটু পরেই উঠতে হল তাকে। সারা শরীরে একটা অস্থিরতা, বুক জ্বলছে, গলা জ্বলছে, চোখ জ্বলছে। কতক্ষণে যাবে ঐ লোকটা, কতক্ষণে ওপরে উঠে আসবে নরেশ।

আঁচলের চাবির গোছা খুলে যমুনা টেবিলের ওপর রাখলো। গয়না সামান্যই আছে গায়ে, এগুলো প্রায় সবই নিয়ে যাবে। নতুন ব্যবসায়ের এগুলোই হবে পুঁজি।

কিন্তু এই দুল জোড়াটা? এটা নরেশের দেওয়া। এটাকে তো খুলে যেতে হবে। আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে যমুনা চোখ থেকে গড়িয়ে নামা চোখের জলের ভিজে দাগ ঘষে ঘষে তুললো আঁচল দিয়ে। তারপর দুল জোড়া খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেঁপে যাওয়া হাত কেবলি ফসকে গেল। কানের গোড়ার চুলের সঙ্গে দুলজোড়া এমন জড়িয়ে গেছে, যে কিছুতেই খোলা গেল না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। যাক তবে। নিজে হাতেই নরেশ এটা খুলবে। হয়ত দেবে একটা হ্যাঁচকা টান, কানের লতি যাবে ছিঁড়ে, কয়েক ফোঁটা রক্ত আর চুলে জড়ানো দুলজোড়া নরেশ রেখে দেবে পকেটে। একটু ব্যথা হয়ত করবে যমুনার, শির শির করবে কান দু'টো, শরীরটা যাবে কাঠের মতো নিস্পন্দ হয়ে, দাঁতে চাপা ঠোঁট দিয়ে একটা যন্ত্রণাসূচক অব্যয় বেরিয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তবু সে এমন বেশি কী! যমুনা একবার দেখতে চায় কতো নিষ্ঠুর হতে পারে নরেশ।

টাইমপীস ঘড়িটা বাজছে টিক টিক করে। যমুনা তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছ'টা। ঐ শব্দ জানান্ দিচ্ছে, ফুরিয়ে এল, যমুনার বধূজীবনের পরমায়ু ফুরিয়ে এল। ঐ শব্দের সঙ্গে তাল মেলে একমাত্র যমুনার আতঙ্কিত হৃৎস্পন্দনের। নিজের বিবাহিত জীবনের এই ক'টা দিনকে মনে মনে থিয়েটারের দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতির সঙ্গে তুলনা করলে যমুনা। অন্ধকার, রুদ্ধদ্বার প্রেক্ষাগৃহ, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো, কয়েক মিনিটের জন্যে সব ক'টা দরজা গেল খুলে, কিন্তু তারপরেই আবার অন্ধকার।

অন্ধকার ছাড়া কী! নন্দেরচাঁদ বাই লেনের দিনগুলিকে অন্ধকার ঘরের দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী মনে হতে পারে। আবার যমুনা ফিরে যাবে সেখানেই। মাকে গিয়ে বলবে, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনেক সেলামি দিলুম মা, এবার ক্ষ্যামা দাও। আমি যা তাই থাকতে দাও।

তখন কী ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাবে মাতঙ্গের মুখ? কী যে উদ্ভট খেয়াল হয়েছিল মাতঙ্গের। নিজের সারাজীবন কেটেছে নন্দেরচাঁদ লেনের পাঁকে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই বেসুরো হারমোনিয়ামের আওয়াজ আর ঘুঙুরের বোল ওঠে। রাত একটা দু'টো পর্যন্ত শোনা যায় রিক্সার ঠুন ঠুন; প্রমত্ত নিশাচর বীটের পাহাড়াওয়ালাকে পালিয়ে ফেরে।

কিন্তু এ জীবনে মাতঙ্গের রুচি ছিলনা। সে স্বপ্ন দেখত একটি ছোট নীড়ের, যেখানে সন্ধ্যাবেলা শাঁখ বাজে, ধূপ-সুরভি ঠাকুর ঘরে একটিমাত্র স্নিগ্ধ ঘৃতদীপ জ্বলে।

মাতঙ্গের চোখের ওপর টিয়া বাড়ি কিন্‌লে, তারও বয়স হয়েছিল, সেই বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসল মাসি হয়ে। আর মাতঙ্গকে শেষ বয়সে করতে হ'ল বাড়ি বাড়ি দাসীবৃত্তি। সময় থাকতে গুছিয়ে নিতে পারেনি, ওর চেহারাটাই দুষ্‌মনি করেছে ওর সঙ্গে। ভারি গলায়

গান উঠতো না, মোটা আঙুলে বাজতো না বাজনা। এখনো বাজেনা, কাঁসার বাসনে শালপাতার বাজনা বাজিয়েই মাতঙ্গের জীবন গেল। টিয়া ওকে করুণা করত। বলত, তুই নিজে তো কিছুই করতে পারলিনি মাতঙ্গ, তোর মেয়েটাকে আমায় দে। ভরা-ভরা শরীর, রোজগারের সময় তো এই। গলাটাও মিঠে, ওকে আমি এমন গান শেখাবো যে লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজিরাও হার মানবে।

টিয়া মাসির বাড়ির সেই হাতে খড়ির দিনগুলি মনে হতেই গায়ে এখনও কাঁটা দেয়। বিকেল হতেই দল বেঁধে গা ধোওয়া। পাতা কেটে, চুল বেঁধে খয়েরি টিপ পরা। তারপর খোলা দরজার দু'পাশের রক ঘেঁষে দু'সার দিয়ে দাঁড়ানো। ওদের মধ্যে তরঙ্গ আবার ছিল সবচেয়ে সাহসিকা। মাঝে মাঝে সে বেরিয়ে গিয়ে সদর রাস্তা কি পার্ক থেকে খদ্দের নিয়ে আসতো। সুবিধে পেলে রাস্তার লোকের হাত ধরে টানাটানি করতেও পেছপা হ'ত না।

কোলে একটা বেড়ালের ছানা, ডান হাতে বিড়ি, তরঙ্গের চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে যমুনার।

প্রথম প্রথম যমুনার বুক টিপ টিপ করত। চৌকাঠ পেরিয়ে সংকীর্ণ প্যাসেজটাতে দাঁড়িয়ে লোকগুলো দেশলাই জ্বালতো, কিন্তু সিগারেট ধরানোর পরেও নেবাতো না কাঠি। একে একে সবাব মুখের সমুখ দিয়ে পুড়ে আসা কাঠিটিকে ঘুড়িয়ে নিয়ে যেতো। সৌরভী, তরঙ্গরা কুৎসিত একটা গালাগালি দিতো, কিম্বা খিলখিল হেসে গড়িয়ে পড়ত এ ওর গায়ে। আর যমুনা দু'হাত দিয়ে ওর মুখটা দিতো আড়াল করে। মনে মনে প্রার্থনা করত, হে ভগবান, আমাকে যেন পছন্দ না করে।

তবু কেউ না কেউ পছন্দ করতোই। সেই অপরিচিতদের নিয়ে দরজায় খিল দিতে গিয়ে হাত সরতো না, বুক দুর দুর করতো, সমস্ত

শরীর আসতো অবশ হয়ে। ওদের হাতে জড়ানো বেলফুলের মালার উগ্র সুবাস ছাপিয়ে উঠতো পানীয়ের গন্ধ।

পরদিন সকালে আবার যে-কে-সেই। স্নান শেষে শরীরটাকে মনে হত প্রথম বর্ষার ভেজা মাটির মত স্নিগ্ধ, সরস, নরম।

টিয়া মাসি কোন কোন দিন নিয়ে যেত গঙ্গায়। ঘাটের উড়ে ঠাকুরের হাতে তিলক কেটে টিয়া মাসি ফিরত এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে। ঘরদোর বিছানায় সেই জল ছিটিয়ে দিতো মাসি। বলত, পাপ, পাপ, পাপে চারদিক ভরে গেল।

প্রথম প্রথম বিস্মিত হ'ত, পরে শুধু মজা পেতো যমুনা। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর এই টিয়া মাসিরই আবার অন্যরূপ। তখন সে তার চুলগুলোকে আলগা একটা গিঁট দিয়ে স্তূপ করে রেখেছে মাথার ওপর, মাংসল শরীরটার আবরণ ঢিলে করে দিয়ে হিসেব নিচ্ছে সকলের কাছে।

সহজ হিসেবের ওপর আরেকটা উপরি হিসেব ছিল টিয়া মাসির। আইনকে নল্‌চের আড়াল দিয়ে চুপে চুপে চোলাই মদের ব্যবসা চালাতো। অবশ্য যারা আসতো ওদের কাছে তাদের অনেকেই আগে থেকে চুর হয়ে আসতো। কিন্তু তবু প্রায়ই এখানে এসে ওদের তেষ্টা পেতো। তখন হয়ত নিশুতি রাত। কোথায় আছে নির্ঝরিণী?

আছে। টিয়া মাসির কাছে আছে। ওর তোষক ঢাকা তক্তপোষের আল্‌গা পাটাতনের নিচে চোরা-সিন্দুকে ঝক্‌ঝকে বোতল সর্বদাই মজুত। খিল খুলে এক একটি মেয়ে বাইরে আসে, টিয়া মাসি বারান্দার কোণেই দাঁড়িয়ে। কীরে, কী চাই? কাছে এসে অন্তরঙ্গ সুরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েরা চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করে, আছে?

আছে। ক' বোতল?

সন্তর্পণে তোষক তুলে, তালা খুলে চোরা সিন্দুকের রহস্য উন্মোচন করে টিয়া মাসি। আঁচলে দশ-বিশ টাকার নোট বাঁধতে বাঁধতে বলে, ভাগ্ এবার। পালা। যতো সব পাপ জুটেছে এখানে।

মুখ টিপে টিপে হাসে মেয়েরা। আর ক' বোতল আছে টিয়া মাসি? তখন টিয়া মুখ খুলে গাল পাড়তে শুরু করে। বোতল? কিসের বোতল। সিন্দুক ভর্তি সবতো গঙ্গাজল।

শুধু গঙ্গাজল, মাসি?

হাসতে হাসতে মেয়েরা চলে যায়, টিয়া মাসিও হাসতে শুরু করে। এ মাসে যদি পঞ্চাশ বোতল চালাতে পারিস সৌরভী, তবে তোর কুকুরের বরাদ্দ আধপো মাংস আমি একপো করে দেবো।

ক্রমেই সয়ে আসছিল। কিন্তু তবু যেদিন সৌরভীর ঘরে একটা লোক খুন হল, সেদিন ভয় পেয়েছিল যমুনা। পুলিশ এলো, ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। জেরা করলে কত রকম। সৌরভীকে বুঝি মারধোরও করেছিল। ওদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হল গলির মোড়ের পানওয়ালাটাও।

তারপর ওরা একদিন ছাড়াও পেল। লোকে বলে টিয়া মাসি ঘুষ খাইয়েছিল পুলিশকে। কিন্তু সৌরভীকে ওরা রেখে দিলে। সব কাহিনী যখন জানা গেল, তখন গায়ে কাঁটা দিয়েছিল যমুনার। ঐ লোকটা সম্প্রতি সৌরভীর ঘরে কিছু ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিল। ফুরফুরে বাবু ছিল লোকটা; পায়ে পাম্পসু, গায়ে মিহি পাঞ্জাবি। দামী সিগারেট ছাড়া খেতো না। পকেটের রুমাল সর্বদাই এসেন্সে ভুর ভুর করতো। সেই লোকটাকে মোড়ের পানওয়ালার সঙ্গে ষড় করে মারলে সৌরভী। লোকটা রোজ সন্ধ্যাবেলাতেই আসবার আগে ঐ দোকান থেকে পান কিনে খেতো। পানের সঙ্গে কী একটা ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল সেদিন, লোকটা টলতে টলতে সৌরভীর বিছানা

পর্যন্ত এসেই কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর গভীর রাতে সেই পানওয়ালাটা আর সৌরভী—

সৌরভী? উঃ ভাবতেও শিউরে উঠে শরীর। ময়লা ময়লা বোকা বোকা চেহারার এই মেয়েটির সঙ্গেই যমুনার ছিল সবচেয়ে বেশি ভাব। ভারি আমুদে ছিল সৌরভী, কথায় কথায় হাসত। তার পেটে পেটে এত—

দশ বছর জেল হয়েছিল বুঝি সৌরভীর।

সেই থেকে সন্ধ্যা হলেই গা ছম ছম করতো যমুনার। প্রায় মাস ছ'য়েক ও-বাড়িতে কেউ আসতো না। যতদিন মামলা চলেছিল, পুলিশ থাকতো দরজার সামনে পাহারা।

টিয়া মাসি কিন্তু বেশি ঘাবড়ায় নি। খালি বলত, বাসাটা বদলাতে হবে। এটার বড় বদনাম হয়েছে।

তোমার ভয় করে না টিয়া মাসি?

ভয়? মেজেয় পানের পিক্ ফেলে টিয়া মাসি বলেছে—থুঃ। এই চল্লিশ বছরের জীবনে এই নিয়ে কম-সে-কম দশটা খুন দেখলুম।

শেষ পর্যন্ত বাসা আর বদলায়নি টিয়া মাসি। খালি যে ঘরে সৌরভী থাকতো সেই ঘরটা চুনকাম করে দিলে। দেয়ালে ঘটা করে দিলে গঙ্গাজলের ছিটে।

মাতঙ্গ মাঝে মাঝে দেখতে আসতো ওকে। যমুনা বলতো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল, মা।

আদর করে ওর মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে উকুন বেছে দিতো মাতঙ্গ, বলত, নিয়ে যাবোরে, যাবো। তোর বিয়ে দেবো।

বিয়ে দেবে! প্রথমদিন কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল যমুনা; সোজা হয়ে উঠে বসেছিল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা। আমাদের কি বিয়ে হয়, বেশ্যার মেয়েদের?

বেশ্যার মেয়েদের! চোখ দু'টো মাতঙ্গের একবার জ্বলে উঠেছিল, তারপর ওর দৃষ্টি সুদূর হয়ে গিয়েছিল।

হয় কিনা জানিনে, তবে আমি তোর বিয়ে দেবো, দেখিস্। আস্তে আস্তে দৃঢ়তার সঙ্গে মাতঙ্গ বলেছে।

যেদিন থেকে পরের বাড়ির ঝি-গিরির কাজ নিয়েছে মাতঙ্গ, সেদিন থেকেই ওর মাথায় এই ভূত চেপেছে। গৃহস্থবাড়ির রূপ কাছে এসে দেখতে পেয়েছে, আর যত দেখেছে, ততই ওর মনে মোহ জমেছে ফোঁটা ফোঁটা মধুর মতো। তকৃতকে উঠোন আর সাজানো-গুছানো ছোট একটি ঘর—এমনি বাড়ি যদি একটি তার হোত! এখানেও কলহ আছে, নীচতা আছে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আছে অনির্বচনীয় একটু মাধুর্য; পরিপূর্ণ শুচিতা আর শ্রী। এ ঘর মাতঙ্গ কখনো পাবে না; সে বয়স নেই, কিন্তু পায় যেন যমুনা। কিন্তু সে কেমন করে? কোন্ পথে এই পঙ্কজকে সে পৌঁছে দেবে পূজার বেদীমূলে। উপায় যা হোক একটা কিছু স্থির করতে হবে, ততদিন যমুনা থাক নদেরচাঁদ বাই লেনে।

সৌরভীর খালি ঘরে নতুন যে মেয়েটি এল, তার নাম শ্যামা। বেশিদিন আসেনি কলকাতায়। এই বছর চারেক হ'ল।

মোটে চার বছর?

তুমি বলছ ভাই মোটে? আমার মনে হয় এক যুগ হয়ে গেল। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে শ্যামা; কাঁদতে কাঁদতে ওর স্খলনের ইতিহাস বলে, গ্রামের বালবিধবার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের সম্ভাবনা, কলঙ্কের ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসা—

তারপর, তারপর? উৎসুক রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা জিজ্ঞাসা করে।

ম্লান একটু হাসে শ্যামা। বলে, তার আর পর নেই।

তরঙ্গ মাঝখানে তীর্থে গিয়েছিল, কয়েকমাস বাদে ফিরে এলো ফ্যাকাশে হয়ে।

কী হয়েছিল তোর তরঙ্গ ?

কী হয়নি তাই জিজ্ঞেস কর বরং। টাইফেট্, নিমুনিয়া, আরো কত কী।

চেহারা কিন্তু তোর বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে ভাই।

দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় তরঙ্গ। বলে, বেঁচে যে আসতে পেরেছি, এই ঢের। বাবা বিশ্বনাথের কৃপা।

শ্যামার কিন্তু বিশ্বাস হয় না তরঙ্গের গল্প। যমুনাকে বলে, বিশ্বাস করলি তুই ওই মাগির গাঁজাখুরি গল্প ? অসুখ হয়েছিল না হাতী। ও নিশ্চয়ই পোয়াতী হয়েছিল, নষ্ট করে এসেছে, আর নইলে ওর ছেলে হয়েছিল, সেটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে যমুনা, বুঁজে আসা গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি জানলে কী করে ?

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল শ্যামা। কথাটা না শোনার ভান করে দূরের চারতলা বাড়ির ছাতের দিকে চেয়েছিল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হতে সামান্য একটু হেসে বলেছিল, চেহারা দেখলেই আমরা টের পাই যে। আমারো হয়েছিল।

তোমার ছেলে হয়েছিল ? উত্তেজিত গলায়, প্রায় চীৎকার করে, জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

পায়ের নখ দিয়ে সিমেন্ট ঘষতে ঘষতে শ্যামা জবাব দিয়েছিল,—হয়েছিল।

কী করেছ সেটাকে ? জলে ভাসিয়ে দিয়েছ ?

না। খুব নীচু গলায় শ্যামা ধীরে ধীরে একবারো-না-কাঁপা গলায় বলেছিল, গলা টিপে মেরেছি।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি কেউ। তারপর শ্যামা বুঝি জোরে হেসে উঠেছিল। তোর মনটা এখনো কাঁচা আছে যমুনা। তোকে

এখানে মানায়না, গেরস্তের ঘরে মানাতো। দিব্যি ঘোমটা টেনে, নোলক পরে বসে থাকতিস্।

তরঙ্গের সঙ্গে ঘেন্নায় তিন দিন কোন কথা বলতে পারেনি যমুনা। বিবর্ণ, ঐ পাংশু মেয়েটিই কি তার সদ্যোজাত শিশুকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে জলে? বিশ্বাস হয়না। শ্যামা বলেছিল, ছেলে তো কেউ চায় না, তাই মেরেছে; এই যদি মেয়ে হোত, তবে দেখতিস কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে হাজির হ'ত তরঙ্গ, অসুখ-টসুখের কথা আর সাজাতে হ'ত না।

মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে টেরি কাটা এই বাব্রি চুলওয়ালা লোকটার সঙ্গে শ্যামার ঘরে আলাপ। লোকটা প্রায় সন্ধ্যাতেই শ্যামার অতিথি হ'ত। শ্যামা নিজে নাচতে জানতো না, তাই মাঝে মাঝে যমুনার ডাক পড়ত। লোকটা একদিন ফরাসের ওপরই ঘুঙুর শুদ্ধ পা জোড়া জড়িয়ে ধরেছিল যমুনার। এমন পাখির মতো হালকা পা তোমার, থিয়েটারে নামো না কেন?

থিয়েটারে? বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

হ্যাঁ, ডায়না থিয়েটারে নাচ শেখায় লোকটা। নাট্যকার হবে শীগ্গিরি। মাঝে মাঝে বগলে করে একটা এক্সারসাইজ খাতা নিয়ে আসতো, সেইটেই ওর স্বরচিত নাটক। সুভদ্রাহরণ কি ওই জাতীয় নাম হবে। শ্যামার ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে সেই নাটকের মহলা হ'ত। লোকটা একটু একটু করে পড়ে শোনায়, এক এক চুমুক খায়, আর রক্তিম মুখচোখে যমুনার দিকে চেয়ে ওর অভিনয় কৌশলের তারিফ করে বলে, এ নাটকে হিরোয়িনের পার্ট তোর বাঁধা। আমি শ্রীমন্তবাবুকে বলে রেখেচি। থিয়েটারে কিন্তু এসব যমুনা-টমুনা চলবে না, তখন তোর নাম হবে মিস্ রোজ।

মিস্ রোজ? গোলাপী রঙের ছিটে লাগত যমুনার গালে,

আমার নতুন কেনা তাকিয়াটার ওপর গড়িয়ে পড়ত হাসতে হাসতে।

শেষ পর্যন্ত যমুনা ডায়না থিয়েটারে হিরোয়িনের ভূমিকায় নামতো কিনা বলা যায় না। কিন্তু মাতঙ্গ একদিন এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

দুপুর বেলা একদিন এসে বললে, আয় আমার সঙ্গে।

কোথায় মা? রাত্রি জাগরণের পর সমস্ত শরীরে শৈথিল্য এসেছিল, ফোলা ফোলা চোখ যমুনার, একটা হাই তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় মা?

মাতঙ্গ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, যা, চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। এক জায়গায় তোর বিয়ের কথা কয়েছি, চটপট তৈরি হয়ে নে।

সাজতে গিয়ে সেদিন বার বার হাত কেঁপে গেল যমুনার। পছন্দ আর হয় না। ছাপা শাড়ি পছন্দ যদি বা হ'ল ব্লাউজের সঙ্গে আর মেলে না। চুলটাই যমুনা বাঁধলে কতো রকম করে।

সাজগোজ সারা করে বেরিয়ে যখন এল, তখন মাতঙ্গ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, তুই এ কী করেছিস্ বল্‌তো যমুনা!

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। কী মা?

এমনধারা সেজেছিস কেন? ভদ্রলোকের বাড়ি যাচ্ছিস, না বেশ্যাবিত্তি কত্তে যাচ্ছিস লা? খোল্, খোল্ শীগগির ওই রঙচঙে শাড়িটা, একটা ফসা লাল পেড়ে কিছু পর। অত গয়নাও পরতে নেই, মোছ গালের রঙ।

ভদ্রলোকের বাড়ি কাজ করে রুচিও কিছু ভদ্রলোকের মতো হয়েছে মাতঙ্গর।

যমুনা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কম্পিত হাতে মাতঙ্গ যা-যা বললে অবিকল তাই করলে। কলে গিয়ে ফের মুখ ধুয়ে এল। মুছে ফেললে কপালের কাচপোকার টিপ। পাতা কেটে চুল বেঁধেছিল অভ্যাস অনুযায়ী, সেটা খুলে চুলগুলোকে সংবরণ করলে সাধারণ একটি খোঁপায়।

মাতঙ্গ খুশি হয়ে বললে, এই তো দিব্যি মানাচ্ছে। মা আমার যেন সরেস্বতী।

রাস্তায় নামতে যতো রাজ্যের সংস্কার এসে জড়িয়ে ধরে পা দুটো, নাছোড় প্রণয়ীর মতো। মোড়ের রহমৎ গাড়োয়ানের ছেলেটা, পানের দোকানের সমুখে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি দিচ্ছিল, সে কি একটা রসিকতা করলে। ওরিয়েণ্টাল থেমটা পার্টির ম্যানেজার রকে দাঁড়িয়ে শিষ দিলে একবার। "স্পিশাল সেলুনের" লম্বা জুলপিওয়ালা কারিগরটা ভ্রূ-ভঙ্গি করলে। অন্যদিন যমুনা হয়ত এক মুহূর্ত দাঁড়াতো, মুচকি হাসতো একটু; আজ ভ্রূক্ষেপ করল না। একে তো মা সঙ্গে যাচ্ছে, তাতে আবার যমুনা যাচ্ছে ভদ্রলোকের বাড়িতে। চালচলনটাও করতে হবে তেমনি। আজ তো মৃগয়া নয়! লোল কটাক্ষ আর ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, সব রেখে যেতে হবে পেছনে, এই নন্দেরচাঁদ লেনে।

সারা রাস্তা মাতঙ্গ যমুনাকে তোতাপাখি পড়াতে পড়াতে নিয়ে গেল। দায়িত্ব তো কম নয়, ঝুঁকিও নয় সামান্য। মেকিকে মন্ত্রবলে খাঁটি করে দেবে মাতঙ্গ, লোহাকে স্পর্শমণি ছুঁইয়ে করবে সোনা।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের এক গলিতে "সমাজ সংস্কারক" অফিস। টেবিলের সম্মুখে সম্পাদক কাজ করছিলেন। সৌম্যমূর্তি, শাদাকালো মেশানো দাড়ির আড়ালে অনিশ্চিত একটা বয়স লুকানো।

মা নমস্কার করলে, মার দেখাদেখি যমুনাও।

মাতঙ্গ বললে, আমার মেয়ে। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার যমুনাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সম্পাদক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হুঁ। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ। ওঁর পায়ের কাছে বসে যমুনা ওঁর বুক পকেটের চেন লাগানো ঘড়িটার অতি ক্ষীণ টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

হঠাৎ খানিকক্ষণ বাদে সম্পাদক সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। একবার ওর, একবার মার, মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে—

মাতঙ্গ বললে, যদি কোন উদার ছেলে পাইতো—

দাড়িতে হাত বুলিয়ে সম্পাদক বললেন, পাবে। কয়েকটি জানাশোনা ছেলে আছে আমার হাতে। এ রকম বিয়ে আমরা গোটাকতক দিয়েছিও। আমরা শুধু কাগজে কলমেই সমাজ সংস্কার করি না, হাতে কলমেও করি। কিন্তু—

কিন্তু কী? না, সামান্য একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। একেবারে গণিকার গর্ভজাত মেয়েকে বিয়ে করতে কোন পাত্র সহজে রাজি হবে না। তার চেয়ে, চশমা খুলে পকেটে রেখে সম্পাদক বললেন, তার চেয়ে ধরো যদি ওদের বলি—

আস্তে আস্তে সম্পাদক ওঁর কৌশলটা ব্যক্ত করলেন। যমুনা দিনকতক থাকবে ওঁদের সমিতি পরিচালিত আশ্রমে। মফঃস্বল থেকে এসেছে, দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীতা, স্বজন পরিত্যক্তা কুমারী, এই ধরণের একটা বিশ্বাস্য গল্প তৈরী করে চালাতে হবে।

আশ্রমে এসে বেশিদিন থাকাও হ'ল না। মা রোজ এসে খোঁজ নিতো। আসতেন 'সমাজ সংস্কারকের' সেই প্রবীণ সম্পাদক গিরিজাবাবু।

এখানে আরো ক'টি মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ হ'ল না। যমুনা সংকুচিত হয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। এখানকার মেয়েরাও মিশুক নয় তেমন। সব যেন কেমন ঠাণ্ডা, বোবা, স্থির। কথা বললে, শান্ত চোখে তাকায় কেবল। যে অতি তরল, অতি মুখর জীবনের সঙ্গে যমুনার পরিচয়, এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

একদিন এক পাত্র এসে দেখেও গেল ওকে। পরে শোনা গেল তার পছন্দও হয়েছে। যখন দেখতে এসেছিল তখন তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস করেনি যমুনা, কিছুতেই স্মরণ করতে পারলো না তার মুখ। পরে শুনলে, নাম নরেশ, কাছাকাছি মফঃস্বলের কী একটা জায়গার ডাক্তার। বিপত্নীক। শুনেছে যমুনার কল্পিত দুর্ভাগ্যের কাহিনী। বিয়েয় আপত্তি নেই।

বিয়ের সেই নির্দিষ্ট দিনটি এল। সেদিন শ্রাবণ মাস, সারাদিন বৃষ্টি। বিকেল হতেই চারধার অন্ধকার হয়ে এল। আশ্রমের গলিটায় থৈ থৈ জল। এমন দিনে কি কারুর বিয়ে হয়! আলো পর্যন্ত জ্বলল না রাস্তায়। এমন দিনে দুর্যোগে লোকে ঘরে বাসি মড়া রাখে, তবু রাস্তায় বার করে না।

শিরশিরে হাওয়া, যমুনা সেদিন গা ধোয়নি পর্যন্ত। কিন্তু তবু গলির বাঁকে সন্ধ্যার একটু পরেই ছ্যাকরা গাড়ি দেখা গেল একটা, আর সেটা থামলো আশ্রমের ঠিক সমুখেই।

দরজা খুলে প্রথমে নামলেন, 'সমাজ সংস্কারক' সম্পাদক গিরিজাবাবু। তাঁর পিছনে আরেকজন লোক কোঁচা হাতে রকে লাফিয়ে উঠলো, সন্তর্পণে, জল বাঁচিয়ে। এই কি বর?

সন্দেহ কী। ছেলে পরা টোপরটাকে সোজা করে বসিয়েছে মাথায়। মুখে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, মুছতে গিয়ে চন্দনের ফোঁটাগুলোও গেল মুছে।

তারপর আস্তে আস্তে আলো জ্বলল, শাঁখও বাজলো। আশ্রমের মেয়েরা উলু দিল। গিরিজাবাবু পুরুত নিয়েই এসেছিলেন, তিনি মন্ত্র পড়লেন, বিয়ে হ'ল।

নতুন জীবন শুরু হল যমুনার।

পরদিন এসেছিল মাতঙ্গ। দূর থেকেই দেখলে নরেশকে, কেননা নরেশ তার পরিচয় জানে না। যমুনাকে তার নতুন পরিচ্ছদে কতো রকম করে যে দেখলে মাতঙ্গ, ঠিক নেই। সিঁথিতে সিঁদুর তুলেছে যমুনা, এ সাফল্য যেন যমুনার একার নয়, মাতঙ্গেরো। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে মাতঙ্গ ওর সারাজীবনের স্বপ্ন সফল করেছে। যমুনাকে প্রমোশান দিয়েছে ভদ্রসমাজে।

নরেশকে বেশি কিছু দিতে হয়নি; মোট দু'হাজার টাকা, সর্বসাকুল্যে খরচ হয়েছে সাতশো। মাতঙ্গের নিজের বলতে আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

তুমি এবার কি করবে মা?

আমি? মাতঙ্গ হেসে বলেছিল আমার জন্যে ভাবিস্ নি। আমার চলে যাবে; আমি তো এবার নিশ্চিন্ত। যে ক'দিন শরীরে কুলোবে খেটে খাবো, তারপর তীর্থটীর্থ—

যমুনার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল, নিজের বলতে মাতঙ্গ কিছুই রাখে নি, সব উজাড় করে দিয়েছে মেয়েকে।

যমুনার মনে আশংকা ছিল, হয়তো নরেশ ওকে জেরা করবে, ওর অতীত জীবনের খুঁটিনাটি জানতে চাইবে। দুর্বৃত্তদের হাতে ওর অপমানের একটা কাহিনী রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা সব সময় যমুনার ভালো খেয়াল থাকতো না। হয়ত কী বলতে কী বলে বসবে, সামঞ্জস্য থাকবে না কাহিনীতে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'ল নরেশের কথায়।

আমি শুনেছি সব, ওর একখানা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নরেশ বললে, তোমার দুর্ভাগ্যের কথা। এতে তোমার কোন লজ্জা নেই, এ লজ্জা আমাদের, আমাদের সমাজের, যারা তোমাকে বাঁচাতে পারে নি।

ঈষৎ উষ্ণ করতল নরেশের, তবু যমুনার হাত যেন হিম হয়ে এল। পুরুষের স্পর্শ জীবনে এর আগেও বহুবার পেয়েছে,—বহু পুরুষের স্পর্শ পেয়েছে,—কিন্তু নরেশের আজকের এই আশ্বাস-বলিষ্ঠ স্পর্শের সঙ্গে কোন অনুভূতির তুলনা নেই। পঙ্ক থেকে উঠে এসে প্রথম নবধারা জলে স্নান করার শুদ্ধ অভিজ্ঞতা।

নরেশ আবার বললে, আমি কিছু শুনতে চাইনে। তোমার অতীত ফুরিয়ে গেছে। বর্তমান আর ভবিষ্যতে কোন ফাঁকি না থাকলেই হ'ল।

মফঃস্বল শহরে ওদের যৌথ জীবনে তৃতীয় কেউ ছিল না। নরেশ কাজের মানুষ, সকাল হতে বেরিয়ে যেতো, ফিরতো দুপুরে, খেয়ে দেয়ে আবার বেরুতো, দেখা হত আবার সেই সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যাটুকুই ওদের দু'জনের যৌথ।

মাঝে মাঝে বুক দুরদুর করতো। কী জানি, কোথায় বুঝি ত্রুটি ঘটে যাবে, নরেশ ধরে ফেলে দেবে ও মেকি; ওর আসল পরিচয় ফুটে উঠবে পারদের মতো।

. কিন্তু আশ্চর্য, সে সব কিছুই হ'ল না। নরেশ কাজের মানুষ, এ সব খুঁটিয়ে দেখার মত অবসর নেই তার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার বুড়ি ছুঁয়ে যাবার মতো বাড়ি আসছে; একটুখানি হেসে কি একটু হাসি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ছে।

আর সন্ধ্যাগুলো? অল্প অল্প হাওয়ায় পাতাগুলো কাঁপে, তির্যক একটু চাঁদের আলো জানালা গলে মেজেয় গড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। সে সন্ধ্যা শুধু ঘন হয়ে বসবার, স্তব্ধ চোখে তাকাবার।

বেশ কাটলো দু'টি মাস।

বৃথাই যমুনা ভয় করেছিল ; অশুভ এতটুকু ছায়াও পড়ল না।

কিন্তু কোথা থেকে দিন তিনেক আগে এসে উদয় হ'য়েছে এই বাবরি চুলওয়ালা লোকটা। কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে।

নরেশের হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাঠ পার হয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে খালি পায়ে বালির ওপর দৌড়ে দেখেছে পা বসে যায় কতোখানি ; একটু একটু দূরে বাব্‌লা গাছ ; কাঁটায় আঁচল গেছে জড়িয়ে, হলুদ ফুল তুলে পরেছে খোঁপায়। কোঁচড় ভরে তুলেছে কাশের গুচ্ছ।

তারপর ধরাধরি করে আবার পা টিপে টিপে আলের রেখা ধরে ফিরে এসেছে। নরেশ দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে ক্লাবে-না-ডিসপেন্সারিতে।

গেট খুলে বাব্‌রিওয়ালা লোকটা চোরের মতো পা টিপে টিপে এসেছিল পেছনে।

নরম মাটিতে পায়ের শব্দ হয়নি। সিঁড়িতে পা দিয়েও যমুনা টের পায়নি পেছনে লোক আছে। দু'টো সিঁড়ি পেরুতেই আঁচলে টান পড়ল। চমকে ফিরে দাঁড়ালো যমুনা। ভীত, চকিত একটা আর্তস্বর কণ্ঠে অর্ধোচ্চারিত হয়েই থেমে গেল। অন্ধকারে একেবারে মুখোমুখি এসে যে দাঁড়িয়েছে তার বাব্‌রি চুলের নিচে রক্তিম চোখ দু'টো জ্বলছে গন্‌গনে উনুনের মতো।

বিচিত্র হাসি খেলে গেল যমুনার মুখে।

কী চাও ?

ওর আঁচল তখনো লোকটার মুঠোতে। বললে, তোমাকে ফিরে নিতে এসেছি।

ফিরে নিতে? কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল যমুনার, নিজের কাছেই অপরিচিত শোনালো।

ফিরে নিতে। নিষ্ঠুর নিশ্চিত কণ্ঠে লোকটা বললে। তারপর আপাদমস্তক দেখে নিলে যমুনাকে। দেখলে ওর সীমন্তের সিঁদুর-রেখা, হাতের শঙ্খবলয়, এয়োতির চিহ্ন। হেসে উঠলো ব্যঙ্গশাণিত গলায়। বাঃ, ভোল্ তো দিব্যি পালটেছ সুন্দরী। কিন্তু আমি তোমায় ভুলিনি। পোষাক বদলালে ভেতরটা বদলায় না। তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

কোথায়?

ডায়না থিয়েটারে... তোমার হিরোয়িন হবার কথা ছিল মনে নেই? তোমার মনে নেই, আমার আছে। অনেক খোঁজ নিয়ে তবে নাগাল পেয়েছি।

যমুনার ইচ্ছে হ'ল কেঁদে উঠে লোকটার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে। নতুন জীবন নিয়ে পরীক্ষা তার, আদর্শ সংসার, উদার দেবতুল্য স্বামী—

কিন্তু স্বর ফুটলো না, একটি কথাও বলতে পারলে না। লোকটার চোখ দু'টি রক্তাভ, কিন্তু সে তো শুধু নেশাতেই নয়, অনুরাগেও। কী এক অদ্ভুত, সর্বগ্রাসী চাউনি ওর সর্বাঙ্গে রসনা লেহন করছে। এই দুঃসাহসী লোকটা চায় কী।

এখানে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছো। এ তোমার স্থান নয়। সত্যি করে বলো যমুনা, তোমার ছিটগ্রস্ত মায়ের খেয়াল মেটাতে তুমি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি করছ না? এই সোনার শিকলে কি অস্বস্তি হচ্ছে না? সত্যি করে বলো পা দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠছে না একজোড়া ঘুঙুরের জন্যে? নদেরচাঁদ লেনের মেয়ে তুমি, রঙ্গে এসে দাঁড়াতে—

থিয়েটারের বই লেখে লোকটা। কথাগুলো লেখে যেমন, বলেও তেমনি সাজানো। আর শুনতে পারেনি যমুনা। ঝুঁকে পড়ে হাতের

কাছে শক্ত গোছের কি একটা পেয়েছিল, সেইটা ছুঁড়ে মেরেছিল লোকটার মুখে।

কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল লোকটার গাল বেয়ে। এক হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বললে, ঠিক লাগল না, ফসকে গেল। হাত তোমার এখনো তৈরি হয়নি।

চাপা, ক্রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা বললে, যা—ও।

যাচ্ছি। কিন্তু কাল সকালে আবার ফিরে আসবো।

পরদিন সকালে যমুনা উৎসুক হয়ে রইলো, ওর মুখটা এক একবার বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নরেশ বেরিয়ে গেল। [illegible] মা এলো বাসন মাজতে। কিন্তু লোকটার দেখা নেই। আশায় আশংকায় যমুনার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কে জানে, লোকটার মত পরিবর্তন হয়েছে কিনা। হয়ত সে ফিরেই গেছে। কিন্তু এতদূর অবধি খুঁজে খুঁজে এসেছে যে, সেকি ফিরে যাবে এত সহজেই।

স্নান, এমন কি খাওয়া দাওয়াও শেষ হ'ল। নরেশ এলো বেলা দেড়টা-দু'টোয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এ সময়টা নরেশ একটু গড়িয়ে নেয়। আজ আর যমুনা নরেশের কাছে বসল না। আজ তার প্রতীক্ষার পালা। কতক্ষণে রাহু আবার এসে দেখা দেবে কে জানে। শেষে বেলাও পড়ে এলো। পশ্চিমের রাস্তার ধারের নারকেল গাছটার ছায়া এসে ঘরে পড়ল, তবু যখন লোকটা এলো না তখন যমুনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ; কুগ্রহ হয়ত কেটে গেছে।

চা খেয়ে নরেশ গেছে তৈরি হয়ে নিতে, যমুনা আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, হালকা সুরের একটা গানও এসেছে মনে, এমন সময়—

সেই কামানো ঘাড়, বাবরি চুল আর ভাঁটার মতো দু'টি চোখ।

আমার ঘরের সেই লোকটা। নদের চাঁদ বাই লেনে ফিরে যাবার খেয়া নৌকার মাঝি।

সিঁড়িতে চটিজুতোর পায়ের শব্দ। নরেশ উঠে আসছে। যমুনা অনুভব করল ওর হাত পা হিম হয়ে আসছে। নরেশ জেনেছে সব। জেনেছে, যমুনা দুর্বৃত্তের উচ্ছিষ্ট অথচ নিরপরাধ নারী নয়। সে নিতান্তই পণ্যস্ত্রী। দেহের পবিত্রতা তার নষ্ট হয়েছে একটিমাত্র দুর্ঘটনায় নয়, অর্থের বিনিময়ে আত্মদানের পৌনঃপুনিকতায়।

চটি জুতোর শব্দ চলে এসেছে ওপরে। এখুনি ঘরে ঢুকবে নরেশ। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল যমুনা, বালিশে মুখ গুঁজলো। হাত-পা অসাড়, কেবল পিঠটা উঠছে ফুলে ফুলে।

কতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, নরেশ ওর শিয়রে বসে। চোখের পাতা, কপাল, চুল কেমন ভিজে-ভিজে। বালিশ শুদ্ধ মাথাটা নরেশের কোলে। আস্তে আস্তে নরেশ ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভয় পেয়েছিলে ? সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল নরেশ।

মিট মিট করে আরেকবার তাকালো যমুনা। এত সুখ বিশ্বাস করা যায় না। এখনো সে এ ঘরেই আছে, এখনও তাকে তাড়িয়ে দেয়নি নরেশ!

কী হয়েছিল ? নরেশ আবার জিজ্ঞাসা করলে।

কিছু না, ক্ষীণকণ্ঠে যমুনা বললে, মাথাটা ঘুরে উঠেছিল একটু। তারপর ভয়ে ভয়ে বললে, শুনেছ সব ?

নরেশ ধীরে ধীরে বললে, শুনেছি।

আমাকে এবার তাড়িয়ে দেবেতো ?

পাগল, নরেশ বললে, এত ঠুনকো কারণেই সংসারটাকে ভেঙ্গে দেবো,—তেমন কাপুরুষ আমি নই। তোমাকে যখন বিয়ে করেছি তখনই কি আমার সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওনি?

বিশ্বাস করতে পারছিল না যমুনা। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, পেয়েছি।

সেই উদারতাকেই আরেকটু প্রসারিত করে দিলাম। তোমাকে তো বারবার বলেছি, তোমার অতীত নিয়ে তো তুমি নও, তোমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়েই তুমি।

আরো কী কী যেন বলছিল নরেশ। পঙ্ক থেকে হাত দুটি তুলে ধরেছে যমুনা সূর্যালোকের দিকে, নরেশ তাকে আবরে ঠেলে দেবে না। সুখাবেশে চোখ দুটি মুদিত হয়ে এলো যমুনার। নরেশ বড়ো, নরেশ উঁচু, নরেশ মহৎ সে জানতো, কিন্তু সে মহত্ব যে এমন অভ্রস্পর্শী তা কখনো অনুমান করতেও পারে নি।

লোকটা চলে গেছে?

—গেছে। আমি দিয়েছি বিদায় করে। তুমি একটু শান্ত হয়ে ঘুমোও মণি।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিল যমুনা। পাথরের একটা বোঝা নেমে গেছে। স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরি শেষ হয়েছে আজ। মহত্বের শুচিস্পর্শে নরেশ ওর সমস্ত গ্লানি মুছে নিয়েছে। এখন থেকে সুস্থ, সহজ জীবন যমুনার। শেষে হ'ল পদে পদে কুণ্ঠার বিড়ম্বনা। শেষ পাতাটিও খসে গেছে, এবার শুধু নতুন, সবুজ পাতা। ওর স্বর্গ অটুট রইলো। লাইসেন্স রিনিউ করে নিয়েছে যেন, অত্যল্পকালের মেয়াদ নয়। নিরেনব্বুই বছরের ইজারা।

কিন্তু সেই নিরেনব্বুই বছর ন' মাসেই ফুরিয়ে যাবে, তাকি যমুনা তখন জানত।

সেই ঘটনার দিন তিনেক বাদে 'সমাজ সংস্কারক' সম্পাদক গিরিজাবাবু এসেছিলেন। সামান্য একটু রোগা হয়েছেন গিরিজাবাবু, কপালে কিছুটা কুঞ্চন, কিন্তু চোখে যেন দিব্য একটা জ্যোতি এসেছে।

প্রণাম করল যমুনা, নরেশ কলরব করে অভ্যর্থনা করল। যমুনার আনত মাথা সস্নেহে শুধু একবার স্পর্শ করলেন গিরিজাবাবু। স্বরোপিত চারা গাছটিকে সতেজ হয়ে উঠতে দেখে আত্মপ্রসাদের হাসিতে যেন মুখখানা ভরে গেছে তাঁর। বললেন, এদিকে কাজ ছিল একটু। তাই একদিন নেমে তোমাদের দেখে গেলুম।

বেশ, বেশ। ভারি খুশি হয়েছি।

নরেশের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কি খুব কাজ আছে নরেশ? দু'টো কথা ছিল।

নরেশ বললে, কিছুমাত্র না। আসুন।

দু'জন মিলে আবার ঘরে ঢুকলেন। ততক্ষণ যমুনা রান্নাঘরে বসে নানারকম খাবার তৈরি করলে।

সন্ধ্যার গাড়িতে গিরিজাবাবু চলে গেলেন। যাবার সময় আবার আশীর্বাদ করে গেলেন। সুখী হ'য়ো। কোন অকল্যাণ যেন তোমাকে কখনো স্পর্শ না করে।

এরপর আরো দু'মাস কেটেছে। মাঝে মাঝে কেবল মায়ের কথা মনে পড়ে মন খারাপ হ'তো। কোথায় আছে মাতঙ্গিনী? এখনো কি দাসীবৃত্তি করছে? যমুনার ইচ্ছে ছিল মাকে কাশী চলে যেতে লিখবে। সেখানে না হয় দু'চার টাকা করে হাত খরচ পাঠানো যাবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। তিন দিন নরেশের অসুখটা চাপা ছিল। অল্প অল্প জ্বর, বুঝতে পারে নি। ক্রমে চোখ দু'টি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, অল্প অল্প কাশির লক্ষণ দেখা দিল। কিসের পর কী ঘটল ভালো বুঝতে পারেনি যমুনা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন

এলোমেলো, অসম্বদ্ধ। যখন বুঝতে পারলো, তখন হাতের নোয়া খুলে ফেলতে হয়েছে, সিঁথির সিঁদুর গেছে মুছে। আর অপরিমেয় সর্বনাশ ওর পরণের শাড়ির সব রঙ কেড়ে নিয়ে শাদা করে দিয়ে গেছে।

সব হিসেব খতিয়ে দেখা গেল, বেশি কিছু রেখে যেতে পারেনি নরেশ।

অতি সামান্য কিছু নগদ, আর এই বাড়িখানা।

কী করবে, কিছু স্থির ছিল না। ভালোমত কিছু স্থির করবার আগেই কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে উঠে বসল।

সঙ্গে বেশি কিছু আনেনি। নিত্যব্যবহার্য দু'চারখানা কাপড়, হাতখরচের টাকা কিছু, আর নরেশের ছবি একটা।

অবলা আশ্রমের গিরিজাবাবু তাঁর ঘরে বসে চিঠি লিখছিলেন। যমুনাকে ঢুকতে দেখে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। প্রণাম করতে বললেন, বোসো। আস্তে আস্তে বললেন, কিছু জানতে পারিনিতো ?

আশ্রমেই একটা ঘর ওর জন্যে নির্দিষ্ট হল। সেই ঘরের দেওয়ালে নরেশের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রাখলে যমুনা। প্রতিদিন ধুপ ধুনোয় সেই প্রতিকৃতির উপাসনা; তাজা ফুলের মালা ফোটোটার গায়ে ঝুলিয়ে দিতো।

ক্ষণকালের জন্যেও যে মানুষটি ওকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছিল, তার আসন যমুনার মনে চিরদিনের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বেঁচে থাকতে তবু নরেশের দু'চারটে দোষ ত্রুটি চোখে পড়ত। মর দেহ ত্যাগ করে সে যমুনার কাছে দেবত্ব লাভ করলে।

গিরিজাবাবু একদিন বললেন, তোমার মার বড়ো অসুখ যমুনা, একদিন দেখতে যেয়ো।

খোলার ঘরের মেজেয় ময়লা বিছানায় পড়ে আছে মাতঙ্গিনী। যমুনা ডাকলে, মা।

চোখ দু'টো যেন অতি কষ্টে মেলে একবার চাইল মাতঙ্গ। এসেছিস ? যমুনার নিরাভরণ হাত দুটির দিকে চেয়ে মাতঙ্গিনীর চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে যমুনার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

যমুনা স্থির করেছিল এখানেই থেকে যাবে, অন্তত মা সেরে ওঠা পর্যন্ত। আশ্রম থেকে ওর জিনিসপত্র আনিয়ে নিলে।

মাতঙ্গ মনে মনে খুশি হ'ল। এখানে তুই থাকবি মা ? থাক তবে। কিন্তু একটু অস্বস্তিও যেন বোধ করছে মাতঙ্গ। সর্বস্ব ব্যয় করে মেয়েকে সে সমাজের ওপর তলায় তুলে দিয়েছে, আবার এখানে এসে বাস করলে যমুনা নেমে আসবে না তো। জীবনের আগাগোড়া ফাঁকির মধ্যে ওই একটুমাত্র সান্ত্বনা আছে মাতঙ্গের, তার মেয়ে ভদ্র। বিধবা হলেও ভদ্র।

বিকেলের দিকে দু' শিশি ওষুধ হাতে করে যে লোকটা ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে যমুনার সমস্ত প্রত্যঙ্গ হিম হয়ে এলো।

সেই বাবৃরি চুল, কামানো ঘাড়, লাল চোখ, কালো দাঁত।

চিনে চিনে আবার এসেছে শনি, পথ শুঁকে শুঁকে।

বোঝা গেল লোকটাও কম বিস্মিত হয় নি। আড়চোখে একবার যমুনার দিকে তাকিয়ে সে মাতঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বসল। ওষুধের শিশি দু'টো রাখলো শিয়রে। চাপা গলায় সেবনবিধি সম্বন্ধে কী যেন বললে মাতঙ্গকে।

মাতঙ্গ বললে, যা বলবে আমার মেয়েকে বলো বাছা। ওই তো এসেছে। একটু থেমে বললে, কপাল পুড়িয়ে এসেছে।

যমুনার মনে হ'ল লোকটার মুখে বিচিত্র একটুখানি হাসি খেলে গেল যেন ; শেষ পর্যন্ত যেন বাজি জিতে গেল সেই। অর্থাৎ যমুনাকে আসতে হ'ল তো আবার নন্দেরচাঁদ বাই লেনে।

মাতঙ্গ বললে, আমার অসুখে গঙ্গাধরই দেখাশুনা করছে। বড় ভালো ছেলে গঙ্গাধর।

কিন্তু ততক্ষণে কঠিন হয়ে গেছে যমুনা। মন স্থির করে ফেলেছে। লোকটার ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। সে যে নেমে আসেনি সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে উঠে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু পালাবে কোথায় ? অহরহ সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে গঙ্গাধর। ওষুধের গেলাস ধুতে কলকাতার যমুনা উঠে গেছে যদি, গঙ্গাধরও গেছে পিছনে। যমুনার ওঠা বসায়, চলায় ফেরায় অনুক্ষণ ওঁর শিকারী দৃষ্টি যমুনাকে অনুসরণ করছে।

কী চায় লোকটা ? এখনো কি ও আশা রাখে যমুনা 'ডায়না' থিয়েটারে যোগ দেবে, ওর লেখা নাটকে হবে হিরোয়িন ?

শ্যামা বললে, তাই। খবর পেয়ে শ্যামা দেখা করতে এসেছিল। যমুনার মুখে আদ্যোপান্ত শুনে বললে, হবে না ? ও একেবারে হন্যে কুকুরের মতো হয়ে আছে যে, তোকে ওই থিয়েটারে নিয়ে যাবে কথা দিয়ে থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে টাকা খেয়েছিল যে।

টাকা খেয়েছিল ? যমুনা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

খেয়েছিল তো। শ্যামা বললে। ডায়না থিয়েটারের মালিক সুদাম শীলকে আমি চিনি। ওর স্বভাবই ওই। টাকা দিয়ে যেখানে মনের মতন জিনিস পাওয়া যায় সেখানে সে পেছপা হয় না।

তারপর ?

—তারপর তুই চলে গেলি। টাকাটা এদিকে ও ভেঙে ফেলেছে। ফেরৎ না দিতে পেরে চাকরি যায় যায়। সেই থেকে ও কেবল তোর খোঁজ করে বেরিয়েছে।...একটু হুঁসিয়ার থাকিস্ ভাই।

মাতঙ্গ সেরে উঠছিল। যমুনা সেইদিনই আশ্রমে চম্পট দিলে।

রাহু এসে উদয় হ'ল সেখানেও।

সন্ধ্যাবেলা সবে নরেশের ফটোতে মালা ঝুলিয়েছে যমুনা। ধূপ জ্বালাতে হবে, এমন সময় বাইরের জানালার কাছে ছায়া পড়ল। কার আবার! গঙ্গাধরের। দু'টো শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যমুনার দিকে। পা দু'টো একবার কেঁপে উঠল যমুনার। এক্ষুণি অবশ্য জানালাটা বন্ধ করে দিতে পারে, কিম্বা দারোয়ান ডেকে ধরিয়ে দিতে পারে লোকটাকে। কিন্তু তা'তে কি নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? তার চেয়ে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক আজ।

কী চাই? কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে যমুনা।

গঙ্গাধর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল।—দরজা খোল, বলছি।

আজ নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে যমুনা। কোথা থেকে অদ্ভুত একটা সাহস এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে নিয়ে এলো গঙ্গাধরকে। ধূপের গন্ধে, দীপের আলোয় রহস্যময় হয়ে আছে ঘরখানা। সেই ঘরের মেজেয় মুখোমুখি দাঁড়াল দু'জনে।

—এবার বলো।

—আমার সঙ্গে চলো। পুরানো কথারই পুনরাবৃত্তি করলে গঙ্গাধর। নির্বিকার কণ্ঠে, অক্লেশে। এতটুকু বিচলিত হ'ল না।

আর সঙ্গে সঙ্গে যমুনা যেন ফেটে পড়ল। লজ্জা করে না, জানোয়ার। কার সমুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জানো না তুমি!

তবু মিটি মিটি হাসছে গঙ্গাধর—লোকটা আসল শয়তান—কার সমুখে ?

হিড় হিড় করে ওকে যমুনা টেনে নিয়ে এলো নরেশের ফোটোর সামনে।—চেয়ে দেখ, আমার স্বামী। উনি আজ নেই, কিন্তু আমি ওঁরই। দেবতা ছিলেন উনি, আমাকে টেনে তুলেছিলেন। মহৎ ছিলেন, আমার সব কিছু জেনে শুনেও ওঁর পাশে স্থান দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। আর তুমি—

নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে গঙ্গাধর বললে, আমি কী ?

—তুমি হীন, নীচ. কীট, কৃমি তুমি। টাকা ঘুষ খেয়ে আমাকে থিয়েটারের মালিকের কাছে বেচে দিতে চেয়েছিলে ; কিম্বা এখনো চাও।

—চাই। অনায়াসে বললে গঙ্গাধর। এখনো চাই। টাকাও খেয়েছি সত্যি। কিন্তু একলা, কিন্তু একলা কি আমি ? তোমার স্বামী—

—টাকা খেয়েছিলেন ? চিৎকার করে উঠলো যমুনা।

—খেয়েছিলেন। শান্ত গলায় গঙ্গাধর বললে, উত্তেজিত হয়োনা, তিনিও টাকার লোভেই তোমাকে বিয়ে করেছিলেন। নতুন ডাক্তার, তখনো পসার জমেনি, পণের টাকায় ডিস্‌পেন্সারি সাজিয়েছিলেন, তোমার মার টাকায়. একটি একটি করে জমানো টাকায়। তখন জানতেন. তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, অদৃষ্টের ফেরে একবার মাত্র লাঞ্ছিত হয়েছ। তারপর যখন জানলেন, তুমি তা নও, তোমার জন্ম এবং বৃত্তি কোনটাই গৌরবের নয়—

—তুমিই জানিয়েছিলে, তারপর ?

—তখন তোমার দেবতা—

—কী।

না, গ্লানি নয়, আত্মধিক্কার নয় ;—কেননা তিনি উদার ছিলেন। কিন্তু হয়ত ভেবে দেখলেন, উপরি উদারতাটুকুর জন্তে কিছু উপরি

টাকা চাই। ভদ্রঘরের মেয়ের জন্যে যদি তিন হাজার পেয়ে থাকেন, তবে গণিকার মেয়ের জন্যে চাই অন্ততঃ আরো তিন হাজার। সহজ হিসেবে সেই মর্মে দাবী জানিয়ে চিঠিও দিলেন গিরিজাবাবুর মারফৎ তোমার মাকে। পেয়েও গেলেন। অতো টাকা তোমার মার ছিল না। সব কুড়িয়ে কাচিয়ে হল এগারোশো। আরো চারশো টাকা নিজে থেকে দিয়ে গিরিজাবাবু রফা করলেন দেড় হাজারে।

টকটকে লাল দেখাচ্ছে যমুনার মুখ। ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রদীপের সলতের বুক জ্বলছে। রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললে, মিথ্যুক।

কর্ণপাত না করে গঙ্গাধর বললে, সেই ব্যাপারটার ফয়সালা করতেই তো গিরিজাবাবু সেবারে তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন।

—মিথ্যুক, মিথ্যুক।

গঙ্গাধর মৃদু হেসে বললে, প্রমাণও আছে। জামার পকেট থেকে বার করলে অতি জীর্ণ, পুরানো একখানা কাগজ। বাড়িয়ে দিলে যমুনার দিকে।

কম্পিত হাতে যমুনা টেনে নিলে কাগজটা। নরেশের হস্তাক্ষর :

"শ্রদ্ধেয় গিরিজাবাবু, আপনি আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন। ভদ্র ঘরের মেয়ে বলিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, সম্প্রতি জানিয়াছি সে জন্মকুলটা। আপনাকে অভিযুক্ত করিতে পারিতাম, জেলেও পাঠাইতে পারিতাম। কিন্তু অতদূর যাইতে চাহি না। ভাবিয়া দেখিলাম, যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে। যদি সমাজচ্যুত নারীকে বিবাহ করিবার সাহস আমার থাকে, তবে পতিতাকে গ্রহণ করিবারও আছে। কিন্তু একটি কথা। আমার এখন কিছু হাত টানাটানি চলিতেছে। যদি যমুনার মাতাকে বলিয়া কিছু টাকা—অন্ততঃ তিন হাজার—"

অক্ষরগুলো ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে এলো। চিঠি থেকে মুখ তুলে একবার গঙ্গাধরের দিকে চাইলো যমুনা। নরেশের ফোটোর পাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে লোকটা নির্লজ্জ, নির্বিকার বিড়ি টানছে। মুখে পরিচিত সেই বিচিত্র হাসি।

হাতের কাছে ফুলদানী ছিল একটা। যমুনার একবার মনে হ'ল, সেটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে আঘাত করে লোকটাকে। কিন্তু আশ্চর্য, সেটাকে তুলতে পারলে না কিছুতে। ওর সমস্ত জোর নিমেষে যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, আঙুলগুলোও অবশ। ঝাপসা চোখে নরেশের ছবি আর গঙ্গাধরের মুখ একাকার হয়ে গেছে।